সরস রচনা

বলাই চক্রবর্তী

রূপসী বাংলা
৮, পি. সি. ব্যানার্জী রোড
কলকাতা-৭০০০৭৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
১ ডিসেম্বর '৬৪

প্রকাশিকা ঃ অম্বিকা চক্রবর্তী
৮, পি. সি. ব্যানার্জী রোড
কলকাতা-৭৬

মুদ্রক ঃ চণ্ডীচরণ পাইন
সত্য প্রেস
১০/২এ, প্যারীমোহন সুর লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ সৌভ্রাত্র চক্রবর্তী

উৎসর্গ

প্রাতিস্বিকতায় সমুজ্জ্বল
প্রতিভার স্মরণে

সূচিপত্র

পুরুষ সুরক্ষা সমিতি

সে এক আজব কাহিনী। একটি বিশেষ গ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মেয়েরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শোনা যায় পাঞ্জাবে নাকি পুরুষের সংখ্যা বেশি। সে যাই হোক সংখ্যা দিয়ে তেমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু মেয়েরা দাপুটে। একের দেখে অন্যরা অর্থাৎ সব মেয়েরাই পুরুষদের পকেটে পুরতে চায়। মা ছেলেকে ও দিদি ভাইকে মারে। স্ত্রীর হাতে পুরুষ নিগৃহীত হয়। মা ছেলে-মেয়েদের সামনেই বাপকে অপমান করে। জামাইবাবু আর দাদারা বৌদের হাতে লাঞ্ছিত হয়।

*   *   *

কিন্তু সব জিনিসের তো একটা সীমা আছে। নীরবে অত্যাচার সইতে সইতে ছেলেরা এক সময়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ছেলেরা গোপনে যোগাযোগ করে একটি মৌন মিছিলে সমবেত হয়। হাতে পোস্টার নিয়ে তারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। পোস্টারে লেখা—'দুনিয়ার পুরুষ এক হও'। 'শাড়ি চুড়ি দূর হটো।' 'জানানা জমানা বদল রহে' 'মর্দানা কো আগে বাড়তে হায়' ইত্যাদি উল্টো পাল্টা ভুলভাল শ্লোগানের পোস্টার হাতে ছেলে-দের মৌন মিছিল।

*   *   *

ফলশ্রুতি—বাড়ি ফিরে প্রায় প্রতিটি পুরুষ লাঞ্ছিত ও অপমানিত ও মহিলা কর্তৃক গণ ধোলিত হন। কিছুদিন সব চুপচাপ। গান্ধীজীর বিশের দশকের আন্দোলনের পর দীর্ঘ দশ বছর পরে আবার যেমন আন্দোলন শুরু হয়, তেমনি ভাবেই মাস ছয়েক বাদে আবার চাপা উত্তেজনা। আবার আন্দোলন। প্রকাশ্য নয়। চাপা। গ্রামের বাইরে একটি পরিত্যক্ত

জঙ্গলাকীর্ণ বাড়িতে পুরুষদের গোপন সভা। প্ল্যান চক আউট করার সভা।

*   *   *

পেশী বহুল শক্তিশালী একটি যুবক। বয়স পঁচিশের মধ্যে। মিলিটারী মার্কা চেহারা। বাই সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মত গোঁফ জোড়া। খসখসে বিশুষ্ক যৌবন নয়। টগবগে চকচকে যৌবন। বুকের পাটা ছত্রিশ ইঞ্চি, নাম দুর্জয় সিং। অবাঙালী। বক্তৃতা শুরু হল। এভাবে পড়ে পড়ে আর ম্যর খাওয়া সম্ভব নয়। বক্তৃতা উত্তেজক। কিন্তু কণ্ঠ চাপা। একজনের বক্তৃতার অংশ বিশেষ—'আমরা বাঁশ ওরা কঞ্চি, বাঁশ দেয়া সম্ভব না হলেও কঞ্চির নিডল দেয়া দরকার।' সকলের কণ্ঠেই এক কথা দজ্জাল মেয়েদের হাত থেকে মুক্তি চাই। শেষে দুর্জয় সিংহের বক্তৃতা—বন্ধুগণ নীরবে, নত মস্তকে আর একতরফা অত্যাচার সহ্য করা সম্ভব নয়। পাথরের বিগ্রহের মত পুরুষরা আর নিগ্রহ সহ্য করবেন। আমরা পুরুষ, রক্তে আমাদের অগ্নিস্রোত। চোখে বিপ্লবের বহ্নি। দুনিয়ায় মালিক আমরা। মেয়েদের বুঝিয়ে দিতে হবে—আমরা শালিখ পাখি নই। ভাইসব আসুন—প্রতিরোধে, প্রতিবাদে, প্রতিশোধে গর্জন করে উঠি। সোচ্চারে বলুন—দুনিয়ায় পুরুষ এক হও। সুভাষচন্দ্রের মত তিনি বললেন—ললনাদের ছলনায় বিভ্রান্ত হবেন না। আপনারা আমাকে শক্তি দিন, আমি আপনাদের মুক্তি দেব।

ব্যস আর যায় কোথায়। জোরসে তালিয়া। স্বামীজী বলেছিলেন দেশের জন্য একশ যুবক চাই। দুর্জয় সিং বললো—একটি মাত্র যুবক চাই। এবং সে যুবক আমি স্বয়ং।

*   *   *

চিৎকার, হৈহল্লা আর তালিয়ার আওয়াজে গোপন সভা ওপন হয়ে গেল। সভার মধ্যে একটি নপুংসক ছেলে ছিল। আসলে

স্পাই। সে পেচ্ছাপ করার নাম করে আগেই বেরিয়ে গিয়ে সভার সংবাদটি মহিলাদের দরবারে পেঁছে দিয়েছিল।

* * *

পরের দৃশ্য। মেয়েরা গাছ কোমর বেঁধে, হাতা খুন্তি, ঝাঁটা, বঁটি, লাঠি, দা ইত্যাদি হাতে নিয়ে প্রায় দশভুজার মত সজ্জিত হয়ে দৌড়ে এসে সভা ঘিরে ফেলে। পুরুষ দলনীদের আবির্ভাব। সভা পণ্ড। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধদের পলায়ন। ফুলপ্যাণ্ট, বারমুডা, দৌড়াদৌড়ি ও পলায়ন। ধুতিদের কাপড় জড়ায়ন। কেউ বা পা পিছলে গোবরে মুখ থুবড়ে পড়ল। কারুর মাথা ফাটা, কারুর চটি খুঁজতে গিয়ে লাঠি খেয়েছে।

* * *

মোটের ওপর অধিকাংশই কেউ পুকুরে, কেউ জঙ্গলে, কেউ বা ভাঙা পাইখানায় আশ্রয় নিয়ে হাঁপাচ্ছে। সব বাড়িই ফাঁকা, তাই কেউ বা নিজের বাড়িতে ঘুরপথে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ গাছের ডালে। শেষে বেশ একজন বৃদ্ধ পকেট থেকে একটি বায়না কুলার নিয়ে লক্ষ্য করলেন—সভাপতি দুর্জয় সিং কিন্তু সভাপতির আসনে যথারীতি উপবিষ্ট। কি সাহস, কতখানি হিম্মৎ থাকলে একলা ফেস করা যায় ঐ শ্রীমতী ভয়ঙ্করীদের। মেয়েদের অন্তর্ধানের পরেও তেমনি অচঞ্চল। নামে ও কাজে প্রকৃতই দুর্জয়।

* * *

তারপর আবার আস্তে আস্তে সবাই এক জোট হল। বাড়িতে গেলে মার খেতে হবে। ওরা তো দুর্জয়ের দুঃসাহসিকতায় বিমুগ্ধ। একটি মালা ও কিছু মিষ্টি নিয়ে আবার অকুস্থলে জড়ো হল।

—দুর্জয়কে সম্বোধন করে একজন বলে উঠলো—আমরা

কাপুরুষ, তুমি মহাপুরুষ। এসো বস হাত মেলাও। জিও-বস, জিও।

দুর্জয় তখনো পাথরের মূর্তির মত স্থির। একি দুর্জয়ের বডি যে ঠাণ্ডা। দুর্জয় মৃত। মহিলাদের আগমন বার্তা শুনে ওর ষ্ট্রোক হয়ে গেছে। হাতল দেয়া চেয়ার বলে বসেই ছিল। জনৈক হিন্দুস্তানী যুবক চীৎকার করে বলল—উসকো ছাত্তি পর লাথ্থি মারো।

ডাকাত পড়বে

মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেকার সোনারপুর। রেল লাইনের দুধারে ধানক্ষেত। আলপথ। চাষীদের কুঁড়ে ঘর। মাঠে শিশির। রাতে ল্যাম্পোর আলো। মঞ্জুদির শ্বশুর বাড়ি। মঞ্জুদি চাকুরিরতা মহিলা। দিনের বেলায় সাংসারিক কাজ থেকে অব্যাহতি। অফিস যেতে হয়তো। রাত্রে অবশ্য রান্না ঘরে যেতে হয়। বিশাল পরিবারের ভাতের হাড়ি দুই জায়ে মিলে নামাতে হত। বলা দরকার একজন মঞ্জুদি। একান্নবর্তী পরিবারে জায়েদের কেউ কেউ ওঁকে ঈর্ষার চোখে দেখতো। ব্যবহারের গুণে অন্যরা প্রসন্ন। শাশুড়ির প্রভাবে সকলেই মৌনব্রত পালনে অভ্যস্ত। স্বামী নিপাট ভদ্রলোক। গ্রামের মাত্র কয়েক ঘর সম্পন্ন পরিবারের মধ্যে ঘোষ পরিবার অন্যতম। রাতের গভীরে সোনারপুরে ডাকাত আসতো। টর্চ মেরে, বন্দুক নিয়ে বড় বড় বাড়িতে হানা দিত।

একদিন রটনা হয়ে গেল ঘোষ বাড়িতে ডাকাত পড়বে। আগের রাতে টর্চ মেরে সব কিছু নাকি দেখে গেছে।

*　　　*　　　*

সমগ্র পরিবার জুড়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। শান্ত নিস্তরঙ্গ পুকুরে বড় ঢিল ফেলার মত। ঢেউ উঠলো। ঘোষেদের একান্নবর্তী পরিবারে বিচিত্র মহিলা সমাবেশ। ঐ সংসারে একজন বাল্য বিধবা পিসিমা ছিলেন। মঞ্জুদির শাশুড়ীর সঙ্গে ওঁর বিরোধ। সম্পর্ক হিন্দুস্তান পাকিস্তানের মত। আসলে কর্তৃত্বের লড়াই। শাশুড়ী মহাশয়া এমনিতে ভাল মানুষ কিন্তু বিধবা ননদকে দুচোখে দেখতে পারেন না। সব কিছুতে ওঁর দোষ খুঁজে বের করা তাঁর গবেষণার বিষয়। ননদ নিরুপায় তাই নির্বাক। দুজনে

দীর্ঘদিন কথা বন্ধ। সামনা-সামনি হলে ঘোমটা টেনে চলে যান পরস্পর।

*   *   *

কিন্তু সেদিনটা ব্যতিক্রমী দিন। বাড়ির পুরুষদের অফিস কামাই। ছেলেদের লেখাপড়া বন্ধ। দুপুরে সভা বসলো। কেউ বাজারে গেল না। রান্না বান্না প্রায় বন্ধ। শুধু চা চলছে। কলকাতাগামী পুরুষেরা চা খেত। সেদিন অবশ্য বেশি বেশি চা চলতে লাগলো। ভাগ্নে অনিলের প্রস্তাব—চল সকলে মিলে গাড়ি ভাড়া করে মূল্যবান গহনা আর টাকা পয়সা নিয়ে কলকাতায় দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাড়ি চলে যাই, বাড়িতে তালা লাগিয়ে। বড় খোকন অর্থাৎ ভোম্বল বলল—অবাস্তব, তাও কি সম্ভব? সভায় মতামত নেয়া হোল। দু'জন ভোটদানে বিরত রইলেন। একজন আপত্তি জানান। বাকি সকলে একবাক্যে স্থির করলো বাড়িতেই থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ আত্মরক্ষার প্রস্তুতি চালাতে হবে। পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের ডেকে সমস্যাটা জানান হল। ভাদ্র মাসেই দুর্গা পুজার জন্য অগ্রিম চাঁদা দেয়া হল। ক্লাবের ছেলেদের বলা হল সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে। ছাদে ইটের টুকরো, কাঁচ ভাঙা প্রভৃতি জড় করা হল। বড় ষ্টোভ তোলা হল। পিচকারি আনা হল। উদ্দেশ্য গরম জল করা। ডাকাত এলেই পিচকারি করে গরম জল মাথায় ঢেলে অভ্যর্থনা করা হবে। ছাদে থাকবে একদল যুবক। বাকিরা পাহারা দেবে। মহিলাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে চারিদিকে ঘরের মধ্যে একটি সংকীর্ণ দালানের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ বন্দী অবস্থায় রাখা হবে। প্রকৃতির আহ্বান উপেক্ষনীয় নয়। তার জন্য বড় বড় গামলা বসিয়ে রাখা হবে। ডাকাতদের চোখে লংকা গুঁড়ো ছিটোতে হবে। কিন্তু এখনকার মত তখন তো কুকমীর চল হয়নি। শক্তি-শালিনী পেশি যুক্ত দুই পুত্র বধূকে লংকা গুঁড়োতে নিযুক্ত করা

হল। কিন্তু ডাকাতরা ওপর দিকে তাকালে তবেই তো মশলা ছিটানো হবে। অতসত ভাববার অবসর নেই কারুর। ছাদের আয়োজন সম্পূর্ণ করে তলায় নামা হল। বলা হল বাড়ির কচি কাঁচাদের অন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সঙ্গে যাবে দু'একজন মহিলা। যারা ধমক দিয়ে থামিয়ে রাখতে পারবে। আদর দেবার অবকাশ কোথায়? বাড়ির সেরা সুন্দরী নববধূ অমিতাকে বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে দেয়া হল। সঙ্গে আর একজন অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে। বউটির মহা আনন্দ। কি একটা কারণে তার পিতার সঙ্গে ঘোষ পরিবারের মনান্তর চলছিল। বলা বাহুল্য পণের টাকা নয়।

* * *

মা পিসিমা প্রসঙ্গ। মা বহু দিনের মৌনব্রত ভঙ্গ করে ননদকে সস্নেহে বললেন—দিদি আগের কথা ভুলে যাও। এখন বাঁচতে হবে তো। পিসিমা সব ভুলেই বসে ছিলেন, কারণ থাকতে হবে তো।

—তুমি আমার গহনাগুলো লুকিয়ে রাখ।

—কোথায় রাখবো?

—কেন সংসার থেকে দু'চার টাকা সরিয়ে যেখানে রাখতে।

—কি আমি চোর? আবার সেই পুরানো কথা?

—বালাই যাট। এখন চোর ফোর কিছু না এখন ডাকাত। শুধুই ডাকাত।

—ঠিক আছে ফ্যানের গামলায় কিম্বা তেঁতুলের হাঁড়ির তলায় রাখছি।

—চেঁচাও কেন?

—ডাকাতদের চর আছে নাকি?

—সোনার কথা বেশি লোকে না শোনাই ভাল। শেষবেশ তক্তাপোষের তলায় আলু পেঁয়াজ আর নারকেলের স্তূপের মধ্যে

অলংকারের নিভৃত শয্যা রচনা করা হল। বিষয়টা অবশ্যই মা পিসিমার মধ্যে টপ সিক্রেট রাখা হল। পাছে অন্য কেউ খামচা মারে। চোরের ওপর বাট পাড়ি করার লোকের তো অভাব নেই। বাড়ির চারপাশে কুল এবং বাবলা ছড়ান হবে। সঙ্গে থাকবে কাঁচ ভাঙা। কাঁচের অভাব থাকায় কাঁচের কয়েকটা সুন্দর গেলাসকে মট মট করে ভাঙা হল। দরজা জানলায় খিল ও ছিটকানি মেরামত করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ছুতোর মিস্ত্রিকে ডাকা হল। মা পিসির ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক আপাতত একদিনের জন্য মুলতুবি রাখা হল। মা চা করে দিলে পিসি মার মুখে মিষ্টি পান তুলে দেয়। নতুন বউ-এর পেটে কি একটা অপারেশন হয়েছিল। শুয়ে থাকার কথা তার। সে কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কাজে নেমে পড়লো। তার কাছে এই মুহূর্তে ডাক্তারের থেকে ডাকাতই বড়। কেষ্ট কাকা খোঁড়া। রিক্সার চল ছিল না তখন সোনারপুরে। ওঁকে চ্যাংদোলা করে পাশের বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হল। সঙ্গে বিড়ি পান নস্যি—যে সব ওঁর নেশার জিনিস তার ব্যবস্থাও করা হল। STD বুথের চল তখন স্বপ্নাতীত। অগত্যা সাইকেল আরোহী যুবকরাই ভরসা। যেখানে যেমন প্রয়োজন ফিট করে রাখা হল। পুলিশ স্টেশনে সর্বাগ্রে সংবাদ পাঠান হয়েছিল সন্ধ্যার পূর্বেই যাতে কয়েক জন কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দেয়া হয় বাড়ি পাহারা দেবার জন্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ফাঁড়িতে পুলিশ কনস্টেবল কম থাকায় ওরা ঠিকমত কথা দিতে পারেনি।

ঠিক সন্ধ্যার সময়। ছেলেরা ঘন ঘন পেচ্ছাপ পাইখানা করার জন্য লাইন দিচ্ছে। মেয়েরা ঘামতে ঘামতে ঠাকুরের নাম জপ করছে। শাঁখ বাজানর ট্রেনিং কমপ্লিট। গ্রাম-গঞ্জের মেয়েরা শাঁখ বাজাতে পটু। কিন্তু অজানা ভয়ে প্রায় সকলের কণ্ঠরোধ। মা পারলেন না। শেষে দাঁত ফোকলা পিসি গাল ফুলিয়ে অনেক কষ্টে ক্ষীণ কাঁপা কণ্ঠে ধ্বনি তুললেন—পুঁ পুঁ, পুঁ উঁ।

বাড়ির চাকর উচ্চ হাস্যে করতালি দিয়ে উঠলো—পেরেছে পেরেছে। বাবার ধমকানিতে অবশেষে সবাই চুপ।

*　　　*　　　*

গভীর রাত। প্রবল প্রতীক্ষা। দারুণ উৎকণ্ঠা। ঠাকুর ঘরে কপাল ঠুকে ঠুকে শাশুড়ি মার মাথায় আলুর মত হয়ে উঠেছে। রান্না খাওয়া বন্ধ। শুধুই চা। গ্রামের লোকেরা অত চা খায় না, সেদিন কিন্তু ব্যতিক্রম। কিন্তু সব জল্পনা কল্পনা মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে ডাকাত এলো না। টর্চের আলো দেখা গেল না বন বাদাড়ের সরু পথে। সব তোড়জোড় ব্যর্থ। এলেই যেন ভালো হত। ঘোষ পরিবার যেন লীগে উঠেও ফাইনালে পেঁছাতে পারল না। সমীর বড় ভাসুরের মেজ ছেলে। সমীর ধূমপান বিরোধী। ওর ঘরেই বিড়ি সিগারেটের টুকরোর স্তূপ। চারিদিকে মাদুর সতরঞ্জের ওপরে লম্বমান যুবকদের নিদ্রিত দেহ। চায়ের ভাঁড় ছড়ান। ধূমপানের চোটে ঘোষ পরিবার থেকে সমস্ত মশার নির্বাসন।

*　　　*　　　*

খুব সকালে মা পিসিমা একত্রে স্নান সেরে গ্রামের অশথ তলায় যেখানে বহু দেব দেবীর শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান, সেখানে গিয়ে পুজো দিয়ে এলেন। ওঁরা মানত করলেন অমাবস্যার দিনে জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেবেন। বলা বাহুল্য তখন এক কেজি মাংসের দাম একশো টাকার ওপরে যায় নি আজকের মত। ধোলাই মোছাই এর জন্য ব্লিচিং আনা হল। সাফাই কর্ম সার। গৃহিনীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল সোনা দানার কথা।

—ঠাকুর ঝি গহনাগুলো বের করে দাও।

পিসি তক্তাপোষের তলায় ঢুকলেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। বোঝা গেল পিসি যেন ভেতরে বেশ বিব্রত। শেষে বেরিয়ে এসে বললেন—পাওয়া গেল না।

—এ্যাঁ বল কি ? তাহলে তুমি চুরি করেছ।

—বাইরের ডাকাত ধরতে না পেরে বাড়ির লোককে চোর বলছ ? ছিঃ। বাড়ির বৌয়ের সোনা কেউ চুরি করে ? আমার কি কাজে লাগবে। অন্য জায়গায় পালিয়ে গিয়ে গহনা পরবো, এই ধারণা তোমার ? বলি হ্যারি। বাড়ি সুদ্ধু হৈ চৈ। ডাকাত ছেড়ে চোর ধরো। চোরকে ধরে আস্ত মারো—শ্লোগান উঠে গেল ! কেউ সরব, কেউ নীরব। সকলেই বিস্মিত, শেষ পর্যন্ত পিসিমা ? না-না তাও কি সম্ভব ! বিচিত্র সংসারের বিচিত্র সংসারের বিচিত্র মানুষ। বিচিত্র তাদের মন। কিসের লোভ। কার জন্য সঞ্চয় ? শেষ বেশ পল্টুকে নির্বাচন করা হল। পল্টুর মজবুত চেহারা। সৎ এবং বুদ্ধিমান। মা ঢুকতেন কিন্তু ওঁর হার্টের দোষ। মেজমা বড্ড লম্বা। মাথা ঢুকে যাবে। অগত্যা জাঙ্গিয়া পরা পল্টুর পাতাল প্রবেশ। যেন ডুবুরি নামছে গভীর জলে। গোপনে বলা হল, না পাওয়া গেলে বডি সার্চ করা হবে। পল্টু যে সৎ। তা হোক চোর ডাকাতে তফাৎ নেই। সৎ অসতে বিশ্বাস নেই। পল্টু মাথায় ধাক্কা খাচ্ছে। পল্টু টর্চ চাইলো। পল্টু নবম শ্রেণীতে পড়ে। বিজ্ঞানের মাষ্টার মশাই সারা বইটায় যা ইমপর্টেন্ট দাগিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে আর্কিমিডিসের সূত্র পড়ে। হঠাৎ একটা ইঁদুর পল্টুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দৌড়ে বেরিয়ে এলো। তারপর বিকট চিৎকার। পল্টু বলছে—ইউরেকা ! ইঁদুর গর্ত থেকে গৃহিনীর গহনা উদ্ধার। ইঁদুর তো চোর নয়, তাহলে পিসিমা চোর ! চোর হন আর সাধুই হন, গাল মন্দ যা কিছু সবই তো ওঁর প্রাপ্য। হতভাগিনী পিসিমা লজ্জায় অপমানে কেঁদে আকুল। গৃহকর্তা অগ্নি মূর্তি হয়ে বড় গৃহিনীকে বললেন—দিদির পায়ে ধরে ক্ষমা চাও। বাইরের ডাকাত ধরা গেল না বলে ঘরের মানুষকে চোর অপবাদ দিলে ! বড় গিন্নী ইতস্ততঃ করে এগিয়ে আসছে দেখে পিসিমা বললেন—অনেক হয়েছে থাক।

যুব পোনা

শুধু পড়া পড়া করলে হবে না। ছেলেকে বাজারে পাঠাতে সাইকেল চড়তে বলতে হবে। ফুটবল মাঠে যেতে দিতে হবে। নয়ত শরীর মন চাঙা হবে না। আনসোস্যাল হয়ে পড়বে। যোগেশবাবু গড় গড় করে বলে যান। স্ত্রী উত্তর দেয়—আচ্ছা আচ্ছা। ভালো ছাত্র হলে ভালো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে। ছেলে অত প্রমিসিং নয়। সবাই যদি ডাক্তার হবে, তবে রোগী হবে কে ? হয়তো লেখা পড়া শিখেও কনট্রাক্ট সার্ভিস পেতে পারে। এই তো বাজার। বেশি ভেবে, বেশি স্বপ্ন দেখে লাভ নেই।

*   *   *

হাঁদারাম বিশু একদিন মায়ের তাড়ায় বাজারে গেল। ফিরে এসে মাকে বলে—দেখ মা কাঁচা লঙ্কাগুলো সব কিন্তু কাঁচা নয়। দু'একটা লাল লাল আছে। আর গরম মশলা এনেছি। অথচ ঠাণ্ডা, গরম নয়।

মা—থাক হয়েছে। ভেণ্ডি কোথায় ?

ছেলে—তুমি তো ডাণ্ড বললে।

মা—হতভাগা।

ছেলে—ডাণ্ড বলে কোন সব্জি পেলুম না। বাজারওলারা হাসে।

মা—হাসবেই তো।

বাবা চাকরি ওভার টাইম সব নিয়ে ব্যস্ত। অবশ্য সংসারের জন্যই করে। কিন্তু রবিবার। হয় তাস পিটবে নয়ত টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখবে। আরে ছেলেকে একটু দেখতে হয় তো।

কে কাকে বোঝাবে। মেয়ে ফুচকা ভালবাসে। ফুচকা খাবার নাম করে প্রায় কালী বাড়ি যায়। বলে—বাবা যদি ফুচকাওলা হোত তবে খুব ভালো হত।

রবিবার যোগেশবাবু নিজেই বাজারে যান। শনিবার ওরা মাছ খায় না। অতএব রবিবার মাছ মাস্ট। ল্যাঠা মাছের দাম শুনে উনি নাম দিলেন ললন্তিকা। গুলের নাম দিয়েছেন গুলশান। চারাপোনা পঁচিশ টাকা। ঠিক আছে। বাজারটা এক চক্কর মেরে শেষ মেশ আবার সেই চারাপোনা পঁচিশ টাকার লোকটার কাছে গেলেন। ইতিমধ্যে একটু হাত বাছা করে তুলনায় একটু বড় সাইজের মাছগুলো একত্র করে শ্লোগান পালটে দিয়ে বলতে শুরু করেছে—চারাপোনা পঁচিশ, যুব পোনা তিরিশ টাকা ইত্যাদি।

এগিয়ে এসে যোগেশবাবু বললেন—একিরে শ্লোগান পাল্টে দিলি যে যুব পোনা আবার কি?

মাছওলা—কেন যুব নেত্রী, যুব কংগ্রেস যুব আন্দোলন হতে পারে, যুব পোনা হবে না কেন? আপনি ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করতেন, সেই তো শ্লোগান দিতেন দুনিয়ার যুব এক হও। মনে নেই?

—ছাড় তোর মাছ, নেবো না। কি আছে আজকে জামাই ষষ্ঠী না ভাই ফোঁটা?

—কিচ্ছু না, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে সাপ্লাই আসছে না।

* * *

হঠাৎ যোগেশবাবুর মাথা টলে যায়। প্রবল ঘাম হতে থাকে। চেনা লোকেরা ওঁর বেসামাল অবস্থা দেখে রিক্সায় করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। ছেলে ডাক্তার ডাকে। কপাল ভাল। ওঁদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে সহজে পাওয়া যায় না। এত দেরি করে আসেন তখন ডেথ সার্টিফিকেট দেবার সময় এসে যায়।

কিন্তু সেদিন এসে পড়লেন।

ডাঃ—কি হয়েছে ?

রোগী—খুব ঘাম হচ্ছে, আর মাথা ঘুরছে।

ডাঃ—কোথায় গিয়েছিলেন।

রোগী—বাজারে, মানে মাছের বাজারে কাটা পোনা নব্বই টাকা দর শুনে কি যেন হল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

ডাঃ—চুপ করুন। মাছ ছাড়ুন। দেখছেন না য়ুরোপে এখন নিরামিষ চালু হচ্ছে।

স্ত্রী—কেমন দেখলেন ?

ডাঃ—মাছের দর শুনে বোধহয় ওঁর প্রেসার বেড়ে গিয়েছিল। প্রেসক্রিপশন করে দিলাম। সাবধানে রাখবেন। ওঁকে হারি, ওরি ও ক্যারি বর্জন করতে হবে।

স্ত্রী—মানে ?

ডাঃ—দ্রুতগামিতা, দুশ্চিন্তা ও গুরুপাক খাবার বর্জন করে চলতে হবে কিছুদিন। বুঝলেন। ছেলেকে বাজারে পাঠাবেন।

স্ত্রী—ধন্যবাদ আপনাকে।

কম্পিউটার

লুনি ঢোল পড়াশুনায় ভাল। ওর বাবার ইচ্ছা উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হলে আর পড়াবে না। অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট খুব ভালো না হলে উচ্চ শিক্ষায় গিয়ে লাভ নেই। অনার্স একটা ফালতু ব্যাপার। কই ইংলণ্ডে তো নেই। আছে মাষ্টার ডিগ্রী। এখানে অনার্স মানে হ্যারাস। এখানে C বা D গ্রুপে চাকরি পেতে হলে পার্টি ব্যাকিং দরকার। এদের কেউ পার্টির প্রভাবশালী মহলে নেই।

*   *   *

আর কম্পিউটার। ঐ যে ছাতার হার্ড ওয়ার নাকি সফট ওয়ার? ওসবের মানে বোঝে না লুনির বাবা। বোঝে পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে কিছুদিন শিখলে হয়ত বা এক দেড় হাজার টাকার চাকরি মেলে, তাও ভাল প্রতিষ্ঠান হলে হয়। কি লাভ। সারা দিনের হাড় ভাঙা খাটুনি। বিয়ে? তথাকথিত ভাল পাত্রের জন্য দু'লাখ টাকা মজুত রাখতে হবে। সেও তো সম্ভব নয়। বহুত সময় লাগবে। লাগুক। তারপর লাগু করা যাবে। এখন রাতের ঘুম নষ্ট করে লাভ কি?

*   *   *

লুনি মাধ্যমিকে ষ্টার পেল। ওর মায়ের আপশোষ মেগাষ্টার হল না কেন? লুনি মাকে বোঝাতে পারে না মেগাষ্টার বলে এখনও কিছু চালু হয়নি। রেজাল্টটা মাকে সে পাবলিক বুথ থেকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছে। নামের বানান? ছ্যাঃ ভদ্র সমাজে মুখ দেখাবে কি করে। চোখ ছানা বড়া। বড়দিকে দেখাল। উনি ভীষণ গম্ভীর। তবু একটু মুচকি হেসে বল্লেন—বিকাশ ভবনে গিয়ে কারেকশন করিয়ে এনো। বড়দির

মুখে হাসি দেখে লুনি বিস্মিত। কিন্তু নিজের নামের বানান দেখে লজ্জিত। বানানটি এইরূপ—লুনি ঢোলের বদলে লেখা হয়েছে—'লুঙ্গি খোল'। ওর বাবা মেয়ের রেজাল্ট দেখার জন্য অফিসে বলে কয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে। মা গম্ভীর। মেয়ের চোখে জল।

—ব্যাপার কি? রেজাল্ট কি? সব চুপচাপ কেন?

—স্টার পেয়েছি।

—তাহলে?

—বোর্ড কি করেছে দেখ।

—ভালই তো!

—নামের বানান দেখেছো?

—ঠিকই তো আছে।

—চোখের মাথা খেয়েছ।

—আরে বাবা ছ্যাঃ ছোট লোকের বাচ্চারা মেসিন অপারেট করে। যত্তসব আনট্রেনড্। কালই চল। সঙ্গে নিয়ে যাব। যা ঝাড়বো না।

—তোমাকে অফিস কামাই করে যেতে হবে না। আরো কিছু বন্ধুদের নামের বানান ভুল আছে। এক সঙ্গে যাবো।

—তোর মত ছোট লোকি করেছে?

—না।

—চিনে যেতে পারবি?

—ঐ তো সল্ট লেকে।

—হারামির বাচ্চাদের কান মুলে দিয়ে আসবি।

*　　　*　　　*

পরের দিনের ঘটনা। বাড়ি ফিরে উদ্‌ভ্রান্তের মত লুনির বাবার প্রশ্ন—

—কি হ

লুনি—বহুত ঝামেলা! এ ডিপার্টমেণ্ট থেকে ও ডিপার্টমেণ্ট। ওবাড়ি থেকে ওবাড়ি।

—তারপর।

—প্রকাশদার সঙ্গে দেখা।

—বিকাশ ভবনের প্রকাশদা, সে আবার কে? ওখানেও বন্ধু জুটিয়েছিস?

—না-না ও আমার ছোট বেলার বন্ধু। একসঙ্গে কো-এডুকেশন স্কুলে পড়তাম।

—কোথায় থাকে?

—দক্ষিণেশ্বরে।

—ওরই কাজ?

—হ্যাঁ।

—বিনা পয়সায় কম্পিউটার শিখেছে নাকি? কি বললি গিয়ে।

—যা বলার বলেছি। দু'দিন বাদে যেতে বলেছে।

—বিকাশ ভবনের প্রকাশ? তোর যদি হিম্মত থাকে, যদি বাপের বেটি হোস তবে ওর লুঙ্গি খুলে দিয়ে আসবি। যতসব বখাটে ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব! আদিখ্যেতা করার জায়গা পাস না। থুতু ফেলে ডুবে মরতে পারিস না?

নাই ট্যাক

নয়ন তারা নাট্য সংস্থা। বেকার ছেলেদের একটি ক্লাব। সব রকমের পুজো হয়। মাঝে মাঝে নাটক নামায়। নাটকে মহিলা পাওয়া সমস্যা। পেশাদারি মেয়েরা এলে ক্লাব রুম ভরে যায়। ঝাপরি জানলার ফাঁক দিয়ে যারা টিভি দেখে টিভি বন্ধ থাকলেও জোড়া জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করে। তাই স্ত্রী চরিত্র বিহীন এবার একটা নাটকের রিহার্সাল হবে স্থির হয়। টাকা আসে কোথা থেকে। প্রধানতঃ প্রোমোটার দেয়। ঠিক এমাউণ্ট না দিলে তার ফ্ল্যাট তৈরীর জন্য রাখা ইট সিমেণ্ট রাতের অন্ধকারে হাপিস হয়ে যায়। বোতল ওরাই জোগায়। বাকি সদস্যরা চাঁদা তোলে। খুব টানাটানি হলে বাপের পকেট মারে। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে আলো প্যাণ্ডেল আর মাইকওলার সঙ্গে বচসা হয়। লাইট সাউণ্ড ভাল হয়নি। মানে মানে কেটে পড়। নয়ত...। ফলে একবারের বেশি দু বার কেউ আর কাজ হাতে নেয় না। ঠিক হল একবার থিয়েটার হবে। কেলে সোনা নামে ক্লাব সদস্যের আব্দার তাকে রাজার পার্ট দিতে হবে। অন্যদের আপত্তি। কেলে সোনার আব্দার—মাল ছাড়বো কিন্তু রাজা হতে দিতে হবে।

অন্যদের বক্তব্য, দেখতে চাকরের মত আবার রাজা হওয়ার সখ-ভাগ।

রাজা তোকে স্যুট করবে না। ক্লাবে নিয়মিত আসে না। রিহার্সাল দেয় না। পার্ট মুখস্থ করে না। তবু নাটকে নামা চাই। শেষে ওর ভাগ্যে চাকরের পার্ট জুটে গেল। রাজা সিংহাসনে বসবেন। রাজা মদ্যপান করবেন। চাঁট হিসাবে

চাকরকে বলবেন—মাংস লিয়াও। চাকর বলবে, রাজামশাই রাজামশাই রান্না ঘরে হাঁড়ি খুলে দেখলুম মাংস নেই।

*   *   *

নাটক সুরু হবার মুখে। ড্রেসিং কমপ্লিট। ফাঁকা মাঠে, গাছের ডালে লোক থিক থিক করছে। কালো সোনার পাত্তা নেই। চায়ের দোকান থেকে ধরে আনা হল কেলে সোনাকে। ও নামবে না। কেন? মুড নেই। তাছাড়া দেখলুম স্টেজের সামনে বাবা বসে আছে দর্শকের আসনে।

—তাতে কি হয়েছে? গুরুজনদের সামনে মাল খেতে হবে। মেয়েদের হাত ধরে টান মারতে হবে।

অভিনয় অভিনয়ই, সত্য তো নয়। ওর পা কাঁপছে। ঘন ঘন বাথরুম যাচ্ছে। বিড়ি ফুঁকছে।

—তবে যে রাজা হতে চেয়েছিলি? নাম শিগগির। ওকে ঠেলে পাঠানো হল অপেক্ষমান রাজার কাছে। কেলে সোনার পা কাঁপছে। গলা শুকিয়ে গেছে। একবার রাজার দিকে অন্যবার দর্শকদের দিকে চাইতে চাইতে বলছে—রাজামশাই রাজা মশাই হাঁড়ি খুলিয়া দেখি...বলেই দর্শকদের দিকে চেয়ে সোল্লাসে বলে উঠলো—হাঁড়ির মধ্যে বাবা নাই।

ওর বাবা ঐ মুহূর্তে পেচ্ছাপ করার জন্য বেরিয়ে গিয়েছিল। প্রবল হাস্য ধ্বনির মধ্যে পর্দা পড়ে গেল।

বাবা ভাড়া

পশ্চিমবঙ্গের নামকরা রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়-গুলোর ছাত্ররা যেমন পড়াশুনায় কৃতি তেমনি প্রায় অধিকাংশ ছাত্ররাই বদমাইসিতে ওস্তাদ।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে র‍্যাগিং হয়। কোনটা গোপন কোনটা বা ওপেন। অথচ মিশনের ছাত্ররা যূথবদ্ধ ভাবে ঐসব অ্যাডালটেরেশানের স্বাদ পায় না। নিছক বদমাইসি করে। কখনও মহারাজদের বিরুদ্ধে কখনো বা অন্য ছাত্রদের বিরুদ্ধে। মোস্তি করা, বিরক্ত করা, খিস্তি খেউড় করা, অন্যদের জ্বালাতন করায় ওরা ওস্তাদ।

* * *

জনৈক মহারাজ ছাত্রদের দিয়ে সিগারেট আনিয়ে খেতেন। ছাত্রটিও ঐ সুযোগের সদব্যবহার করত। ঐ মহারাজের মুখে সর্বদাই সংস্কৃত শ্লোক তাও যে সে শ্লোক নয়। বেদ, উপনিষদ, চণ্ডী থেকে উদ্ধৃত শ্লোক। কিন্তু ছাত্রদের জানা ছিল উনি রেগে গেলে, কামারহাটির অবাঙ্গালী ছেলের ভাষায় খিস্তি করতেন। জনৈক ছাত্র ঐ সুবর্ণ সুযোগ নেবার জন্য প্রস্তুত হল গোপনে। একটা পচা ডিম মহারাজের ঘরের পাপোষের তলায় রেখে দিয়ে সর্বাধুনিক খিস্তি শোনার জন্য রেডি হল। মহারাজ বাথরুম থেকে এসে সবেমাত্র পাপোষে পা দিয়েছেন, আর যায় কোথায়। ঢিপ করে শব্দ হল। মহারাজ পা হড়কে পপাত ধরনীতলে। ছেলেরা দৌড়ে এলো—কি হয়েছে মহারাজ।

—আর বলিস কেন!

কোন বরাহনন্দনের কীর্তি। জানতে পারলে···ইত্যাদি।

ছেলেদের হাসির রোল। অন্য একদিন ওর বারান্দায় বালবটা খারাপ হয়েছিল। ডাকলেন ঐ ডাকাবুকো ছেলেটাকে। লম্বা ছ ফুট জোয়ান ছেলে। মই না হলেও হাত পায়। একটা চেয়ারে উঠে বাল্ব লাগাতে গিয়ে (পাশের আলোয় দেখা যাচ্ছিল) ইচ্ছে করে আলতো করে পরনের লুঙ্গিটা ফেলে দিল। ভেতরে জাঙ্গিয়া ছিলনা। সমবেত ছাত্র বৃন্দের হাঁসি।

—মহারাজ আপনার শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন হল। ছেলেটির নাম মঙ্গল। দেখিয়ে দিল শুধুই মঙ্গল।

মহারাজ দৌড়ে ঘরে গিয়ে বললেন—ছোট লোকের বাচ্চা। লজ্জা সরম কিছু নেই। ছ্যাঃ! দেবভাষা বর্জন করে মহারাজ বাজারি ভাষায় খিস্তি করতে লাগলেন। ছাত্ররা নিজেদের বাপ মা তুলে খিস্তি শুনতে ভালবাসে।

* * *

মঠ মিশনের নিয়ম—ভোরের প্রেয়ার লাইনে উপস্থিত হয়ে এন. সি. সি. করতে হবে। অসুস্থতার অজুহাত দিলে বাগান পরিচর্যা করতে হবে। ফুটবল মাঠে খেলতে হবে। ক্লাশ পালান চলবেনা। চুল বড় হলে ছেঁটে ফেলতে হবে। ছুটিতে বাড়ি থেকে ফিরতে দেরি হলে প্রিন্সিপ্যাল গার্জেন কল করবেন। সিগারেট খেতে দেখলে ধমকানি ইত্যাদি নানাবিধ নিয়ম কানুন। গ্রামের ছেলেরা বেশ কেমন মানিয়ে দিত। যত সমস্যা শহরের ছেলেদের।

* * *

ঘটনা চক্রে একবার দুটি ছেলে গভীর রাতে বোতল পরিষেবা করছিল। গন্ধের চোটে রাত্রে প্রহরারত মহারাজ দরজায় ধাক্কা দিলেন।

হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়ে ছাত্র দুটির অবস্থা বেসামাল। গার্জেন কল হল। তুলনায় ভাল ছাত্রটির বাপ ক্ষমা চাইলেন।

কলেজে রাখা হবে না কোন মতেই। কিন্তু ছাত্র ভালো তাই অনেক চিন্তায় পরে সেই ছাত্রটিকে অন্য কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন মহারাজরাই। খিস্তি খেউড়ের বালি পাথরের মধ্যে থেকে যেন পরিশ্রুত জলের ঝরনার স্রোত উচ্ছ্বসিত হয়ে আত্ম প্রকাশ করলো। সাধারণ স্কুলের মাষ্টারমশাইদের সঙ্গে এখানেই ওদের পার্থক্য। মুসলমান ছাত্রদের নমাজ পড়ার জন্য নিকটবর্তি মসজিদে যাবার ব্যবস্থা করা বা সারাদিন উপোষ করার পরে সন্ধ্যায় ফল আর গরম খাবার যোগানর দায়িত্বও পালন করেন মহারাজরা। এটাই ওঁদের বৈশিষ্ট্য।

*　　*　　*

কোন কোন মিশনে আশ্রমিক, অর্ফ্যান ও বোর্ডার নামে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে থাকার পড়ার ব্যবস্থাও আছে। ওদের মধ্যে একাংশ আবার স্কুলের হষ্টেলে থাকে। তারা অনাথ পিতৃমাতৃহীন অর্থাৎ অর্ফ্যান। যারা বাড়ি থেকে এসে পড়াশুনা করে, অথচ হোষ্টেলে থাকে, তাদের মধ্যে বদমাইসের সংখ্যা বেশি। নানা ধরণের অসভ্যতা তারাই করে। সুযোগ পেলে জমাদারনীদের উত্যক্ত করাতেও তারা অভ্যস্থ। শিকারের বয়স যাই হোক না কেন বেহায়া ছাত্রদের তাতে কিছু যায় আসে না। মদ্যপ হওয়া ছাত্রটি একবার সেকাজ করার জন্য তিরস্কৃতও হয়েছিল।

*　　*　　*

দুটি মারাত্মক ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রটির গার্জেন কল করা হয়েছে। একটিকে তো তাড়ান গেছে, ২য়টির গার্জেন আর আসেন না। সতীর্থদের সঙ্গে পরামর্শ করে বাড়িতে গিয়ে বাবাকে বলে, যেতে হবে না। মহারাজরা ক্ষমা করেছে। বাবার অনুপস্থিতিতে ওর এক কাকুকে ধরে। কাকু আসলে ওর মার বয়ফ্রেন্ড। বাবার সঙ্গে বসে মদ খেতে দেখেছে কাকুকে।

ওর বাবার অনুপস্থিতিতেই বেশি আসে। বাপ ও মার যুগল বন্ধুকে ব্যাপারটি খুলে বলে।

—তোমাকে বাবা সেজে যেতে হবে কেমন। বাড়িতে লিক করবে না।

—বেশ। কিন্তু দুটি বোতল ও পাঁচশো টাকা চাই আমার। তোর মাকেও বলবোনা।

—২শ টাকা আর একটা বোতল দিলে হবে না? আমার হাত তো খালি।

দুদিন ধরে ছেলেটির বায়োডাটা নিয়ে অভিনেতাদের স্ক্রিপটের মত মুখস্ত করে ফেলেন ঐ ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড। কথা দেন মিশনে গিয়ে বণ্ড দেবেন। ছেলেকে ধমকাবেন ২য় বার হলে নিয়ে চলে যাবেন।

এক কথায় বাপের অভিনয় করবেন।

এই ভাবেই বাপ ভাড়ায় চুক্তি হয়। টেলিফোনে ইঙ্গিত দিলেই যথা সময়ে এসে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেবে। ভাড়া করা বাবা নকল ছেলেকে সাবধান করে দেবে। লোকটি ক্রমাগতই ওর জেনুইন বাবার সই নকল করতে থাকলো।

*　　*　　*

কিন্তু ছাত্রটির কপাল ভাল। নির্দিষ্ট দিনে মহারাজের স্ট্রোক হল। তাঁকে নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হল। ডেট পেছোল। আপাততঃ ছেলেটি খুব ফূর্তিতে আছে। বেজায় মস্তি করে। ও ওর বাবার মতই নাস্তিক। কিন্তু ঠেলায় পড়ে রামকৃষ্ণ, সারদা, বিবেকানন্দ ছাড়াও ৩৩ কোটি ১টি (সন্তোষীমা, এ্যানটাসিড দেবী) দেবদেবীকে মনে মনে প্রণাম করে। রাস্তার ধারের অশ্বত্থতলায় এক গাদা পাথরের সামনে কপাল ঠোকে। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ওর কপালটা একটু ফোলা।

চান্স আছে

নিলয় অলকা। স্বামী-স্ত্রী। অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ। মনের মিল নেই এতটুকু। বিয়ের আগে উভয় পক্ষে অভিভাবকরা রক্তের টেষ্ট করে নিয়েছেন। ভয় পাছে থ্যালাসেমিক কেরিয়ার হয়। ঠিক ছিল রিপোর্ট। দু'পক্ষই বিজ্ঞান মনস্ক। কোষ্ঠির ধার ধারে না। ছেলে-পিলে সুস্থই হবে। রক্তের মিল হওয়া সত্ত্বেও মনের মিল হয়নি। নিলয়ের পার্টনার ছিল। বাক্সে কিছু পুরানো লাভ লেটার ও ছবি পেয়ে অলকা তো ক্ষেপেই আগুন। ফলে খিঁচাইন লেগেই আছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। তুচ্ছ জিনিস নিয়েও প্রবল বিতণ্ডা হয়। পাশের বাড়ির মেয়েরা বেশ উপভোগ করে।

* * *

দোতলার জানলার পাশে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ আছে। তার ঠিক তলায় একটি মাচা। মাচার ছেলেরা তারিয়ে তারিয়ে নব-দম্পতির ঝগড়া উপভোগ করে। বাড়িটার নাম ক্ষেত্র ভবন। দিন-রাত ঝগড়া হয়। আড্ডার মুড নষ্ট হয়ে যায়। সুযোগ পেয়ে একদিন মাচার একটি ছেলে বাড়ির নামের সামনে রঙ দিয়ে একটি নতুন শব্দ জুড়ে দিল 'কুরু'। ফলে ক্ষেত্রভবন কুরুক্ষেত্র ভবনে রুপান্তরিত হল। বাড়ির নামে হস্তশিল্পের ব্যঙ্গ দেখে দু'চারদিন একটু চুপ চাপ রইল। তারপর আবার যেকে সেই।

* * *

আবার সেই দক্ষযক্ষ।

একটা ছেলে তো একদিন রুখে দাঁড়িয়ে বলেই ফেলল—হয়

বাড়ি ছেড়ে দিন। নয় শান্ত ভাবে থাকুন। পাড়ার মধ্যে এসব এ্যালাউ করি না।

*　　　　*　　　　*

দু'চারদিন আবার চুপচাপ। তারপর কি একটা বিষয় নিয়ে আবার দু'জনে তুলকালাম কাণ্ড।

নিলয়—বিয়েতে তোমার বাবা মা আমাদের কম সোনা দিয়েছে।

অলকা—ওজন করে নাওনি কেন?

যতসব ফালতু অভিযোগ। তোমার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে একটা বাঁদরের গলায় মালা দিলে আমি বোধহয় সুখে শান্তিতে থাকতে পারতুম।

*　　　　*　　　　*

দুটো বাঁদর গাছের ডালে বসেছিল। তার মধ্যে একটা একেবারে জানলার গরাদ ধরে। অন্যটা বলল—চলে আয় মানুষের ঝগড়া কি শুনছিস?

২য়টা—আরে দাঁড়ানা। মনে হচ্ছে 'চান্স' আছে।

ওঁ ভল্গা

অনুপম বেজায় কমিউনিস্ট। পিতৃশ্রাদ্ধে অনীহা। ওর মা বুদ্ধিমতী। ওঁর কথা—বামপন্থীরা তো শ্রাদ্ধের বিকল্প অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার প্রচলন করতে পারেন নি। শ্রাদ্ধ আসলে ডিইতারসান। একটা শোকস্তব্ধ পরিবারে অনেক আচার অনুষ্ঠান, অনেক কাজ বিষণ্ণতাকে, আত্মীয় বিয়োগের ব্যথাকে খানিক হাল্কা করে দেয়। মার ইচ্ছাকে বিমুখ করতে পারেনি অনুপম। নিমন্ত্রণ পত্রের ওপরে ওঁ গঙ্গার বদলে ওঁ ভল্গা লিখতে বলে। রাশিয়া, ভল্গা, ভদকা লেনিন এসব ওর প্রিয় নাম। বাবা শ্রাদ্ধের পরে ভল্গা নদী হয়ে স্বর্গে যাবেন। আচ্ছা তাই হোক।

*   *   *

জানিনা শেষ পর্যন্ত সেই কার্ড বিলি হয়েছিল কিনা। ওর বন্ধুরাও সব কমিউনিস্ট। তবে এক গোত্রের নয়। কেউ চীনের চেয়ারম্যানকে আমাদের চেয়ারম্যান বলে। কেউ বাবা মার ফটো দেয়াল থেকে সরিয়ে দিয়ে চারু মজুমদারের ফোটো ঝোলায়।

*   *   *

একবার অনুপমের খুব পক্স হয়েছিল। ভীষণ জ্বর। কিছু গেলান যাচ্ছিজ না। মা বললেন—সাগুটা খেয়ে নে। তোর তো রাশিয়া পক্স হয়েছে।

—সত্যি ?

ডাক্তারবাবু তো তাই বললেন।

অনুপম সাগু খেল। যাক রাশিয়ান পক্স যখন, তখন তো ভালই হয়েছে। অনুপম তাস, কেরাম প্রভৃতি ইনডোর খেলায় আগ্রহী। ভুলেও মাঠে যায় না। অথচ রাশিয়ান টিম কলকাতায়

এসেছে শুনে দৌড়াল কলকাতার খেলার মাঠে। সে যে কমরেড! ফলাফল—রাশিয়া বিজয়ী, ভারত পরাজিত। সে কি আনন্দ অনুপমের। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র সব কিছুকেই বৈজ্ঞানিক ভাবে গড়ে তুলেছে। এ কে গোপালনের সেই বিখ্যাত উক্তি—রাশিয়ায় কুড়ি কোটি জীবন্ত দেবোপম মানুষ চলন্ত পৃথিবীতে বিরাজমান। আহা কি বক্তৃতা। স্টালিনের রাশিয়া তো। স্টালিন কথায় অর্থ তখন অনুপমদের কাছে স্টীল-ইন-স্টালিন। অনুপম সম্ভি জানে। স্টালিন মস্ত কঠিন ব্যক্তিত্ব। বাইসাইকেলের হ্যাণ্ডেলের মত পৌরুষ দীপ্ত গোঁফ। পৌরুষ দীপ্ত চেহারা। এই না হলে রাশিয়ার নেতা! অনুপম আদারওয়াইস ভালো ছেলে। রাজ-নীতির ব্যাপারে এক বগ্গা। ওদের একটা ক্লাব রুম আছে। পার্টি অফিস স্বতন্ত্র। বিড়ির ধোঁয়ায় সেখানে একটি মশাও তিষ্ঠতে পারে না। দম বন্ধ হবার উপক্রম। তাই মাঝে মধ্যে মাঠের খেঁজুর গাছের তলায় সদল বলে বিড়ি টানে। প্রচণ্ড ধোঁয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইডের অতি ভক্ষণের ফলে গাছটি মৃতপ্রায়। অনুপমদের সমিতির নাম মশক নিবারণী সমিতি।

* * *

অনুপম সম্প্রতি বিবাহ করেছে। বাপের একমাত্র কন্যা। বাপ মেয়ে দুজনেই ভালো। পাত্র হিসাবে অনুপমের কোন দাবি-দাওয়া ছিল না। সাদাসিধে ছেলে। আয় কম। বাজে খরচও করেনা। কেবল ষোল বছর বয়স থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির কাছে কাছে থাকতে থাকতে কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। অনুপমের শ্বশুর মশাই পোষ্ট মাস্টার। ওঁর আবার ভীষণ কমিউনিস্ট এলার্জি। ওঁর বাড়িতে সমবয়সীরা আড্ডা দিতে আসেন। সকলেই চা পান খান। মেয়ে ভালো চা করে। ওঁর আড্ডায় রাজনীতি, ধর্ম সবই আলোচ্য বিষয়। উনি কংগ্রেস মাইণ্ডেড। ওঁর নাম সদানন্দবাবু। অথচ সদানন্দে থাকতে

পারেন না শুধুমাত্র কমিউনিস্টদের জন্য। কমিউনিস্ট যুবকরা ওঁর কোন ক্ষতি করে না। বরং যথেষ্ট সমীহই করে। কিন্তু দেশের? ওঁর ধারণা ওরা শুধুই ট্রাম বাস পোড়ায়। ধর্মঘট করে। মারামারি করে। পঞ্চাশের দশকের সময় তো।

* * *

শেষ বেশ ওঁর জনৈক বন্ধু বলেন—সাহস দিলে একটা কথা বলতে পারি।

—বল।

—তাহলে দেখে শুনে কমিউনিস্ট জামাই করলেন কেন। বলছেন তো ডাকাত।

—আরে গায়ে জোর থাকলে ডাকাতি করতো? জোর নেই তাই মাষ্টারি করে। ওঁর ভাষায় কম+অনিষ্ট=কমিউনিস্ট। এখন উনি মৃত। ক্ষমতাসীন কমিউনিস্টদের দেখলে এখন কি বলতেন বেশি+অনিষ্ট=? না তা হয়ত বলতেন না, কারণ ওঁদের মধ্যেও তো ভাল লোক আছেন!

ফ্যামিলি প্ল্যানিং

সাঁওতাল পরগণা। দেওঘরের পাশেই। ছোট্ট নদী দাড়োয়া নদী বললে লজ্জা দেওয়া হয়। ক্ষীণ জলের ধারা। খালের মত। দু'পাশে কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু উঁচু বালুর চর। সাঁওতালদের পল্লী খুব কাছাকাছি। বেশ দুস্থ ওরা। পুরুষরা মুনিষ খাটে। মেয়েরা জল তোলে— কাঠ কাটে, গোবর কুড়োয়। ঘাস ছেঁড়ে পোষা গরু ছাগলের জন্য। অভাব আছে। অশিক্ষা আরও বেশী।

একটু দূরে বাজারের কাছে বিহার সরকারের বি. ডি. ও. অফিস ও ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেণ্টার। ঐ ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেণ্টার থেকে আসে মিসেস রমা রায় সাঁওতাল পল্লীতে। পল্লীতে পল্লীতে শিশুর পরিচর্যা, প্রসূতির সেবা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ আর বাপ-মার স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে দরকারী কথা শোনাতে। পুরান্দা সার্কেলে ঐ কাজের জন্যই মিসেস রায়ের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। রোজ মহল্লা কে মহল্লা ভিজিট করতে হয় ওকে। তারপর রাতে হ্যারিকেনের আলোয় বসে কার বাড়ীতে কটা বাচ্চা, হাসপাতালে আসতে বললে ছেলে মেয়েরা কি বলে—তার রিপোর্ট বানাতে হয়। সোজা কাজ কিন্তু জটিল সমস্যা। কেউ মুখ খুলতে চায় না—না মরদ না বিবি। কেউ বুঝতেও চায় না রমার কথা। ওসব বাহুল্য মনে করে। ছাতা খুলে মাইলের পর মাইল হাঁটে রমা। চেষ্টার ত্রুটি রাখে না। তবু সাড়া মেলে না। মরদরা প্রায়ই ঘরের বাইরে চলে যায় জীবিকার সন্ধানে। মেয়েরাও তাই। যারা ঘরে থাকে তারাও বেরোতে চায় না।

সার্কেল অফিস থেকে ডাক পড়ে রমার। রিপোর্ট চান

ডাক্তারবাবু। রমা নার্ভাস হয়ে পড়ে। কেন পুয়োর রেসপনস্ ? কি এক্সপ্লানেশন ?

—আপনার একসপিরিয়েন্স কি বলুন তো ? প্রশ্ন করেন সার্কেল অফিসার ডাক্তারবাবু।

রমা নীরব।

—চুপ করে রইলেন যে, রিপোর্ট দিন।

—কি বলবো স্যার ?

—আপনার অভিজ্ঞতা সুবিধা অসুবিধা সবই বলুন।

—কেউ সাড়া দেয় না।

—তার মানে আপনি তাদের কনভিনস্ করতে পারেন না।

—খুব ব্যাকোয়ার্ড এলাকা স্যার, আদিবাসী সাঁওতাল সব যে।

—সে জন্যেই তো ট্রেনড হ্যাণ্ডদের পাঠানো। সকলেই যদি লিটারেট হয় তবে আপনাদের যেতে হবে কেন ?

—লজ্জা করে স্যার !

—হোয়াট, লজ্জা ? কেন ?

—এমনি।

—এসব লেম একস্কিউস ছাড়ুন।

—পুরুষদের কাছে বলতে সঙ্কোচ হয়। আর মেয়েরা বোঝে না, তাড়া করে।

—হোপলেসলি ফেলিয়োর দেখছি আপনি। না আপনাকে দিয়ে একাজ হবে না।

অফিসার বিরক্তি প্রকাশ করে।

রমা মাথা নিচু করে ঘামতে থাকে।

—যান।

—স্যার ?

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

—দয়া করে বদলি করবেন না যেন ?

—বদলি করার মালিক কি আমি একা ! ফাইলের মধ্যে মুখ গুঁজেই উত্তর দেন অফিসার।

—এখানকার জল হাওয়াটা ভাল, তাছাড়া পাঁচ-সাতটি বাচ্চা নিয়ে এখান ওখান করা।

—এ্যাঁ, আপনারও ?

মস্তক মুণ্ডন

ঝণ্টু একটু ফাণ্টুস টাইপের ছেলে। হেভি রেলাবাজ। তখন অমিতাভ বচ্চনের ভীষণ মার্কেট। ওর ইচ্ছা হল গুরুর মত করে চুল ছাটবে। সিনেমা হলের উল্টো দিকেই সেলুন। সেলুনে গিয়ে বলল—গুরুর মত করে চুল ছেঁটে দাও। বচ্চনের একটা বই চলছিল তখন ঐ হলে।

ঝণ্টু বলে—ঐ সিনেমার নায়কের মত করে ছাটবে বুঝলে। ছাটাই শুরু হল। আগে ঘাড়ে ম্যাসাজ করে দিতে বলল। স্পণ্ডেলাইসিসের যন্ত্রণা হচ্ছিল ঘাড়ে। ম্যাসাজ করতে করতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। আরাম আর কাকে বলে। হঠাৎ চোখ খুলে গেলে আয়নায় মুখ দেখে লাফিয়ে ওঠে। একি ন্যাড়া করে দিলে যে।

ঐ তো বল্লে—নায়কের মত করে।

আরে নায়ক কে? বচ্চনকে চেন না?

নাপিত—আজ তো শুক্রবার, বই তো বদলে গেছে। এখন তো শ্রী চৈতন্য এসেছে।

—এক থাপ্পড় মেরে দৌড়ে ক্লাবে গেল। ইয়ার বন্ধুরা বল্লে—একি রে তোর তো রবিবার বিয়ে, এখন ন্যাড়া হলি?

—দেখনা মাইরি। নাপতে বাচ্চার কেলেংকারী! আমি তো জানি না বচ্চনের বই চলে গেছে। এখন শ্রীচৈতন্য চলছে।

—কি করবি এখন। শোন বলবি হঠাৎ মা মরে গেছে। বিয়ে তো আজকাল পুরুতের হাতে মোটা কিছু গুঁজে দিলেই হয়ে যায়। গোত্র চেঞ্জ থেকে অশৌচান্ত সবই হয়ে যায়।

—জ্যান্ত মাকে মৃত বলবো কি করে।

—হয়রে হয়, সবই হয়।

—বাড়িতে গিয়ে কি বলবো ?

আসল কথাটাই বলবি যা সত্য। তোর দোষ নেই। ভুল আর দোষ তো এক নয়।

—বাড়িতে মা মরার কথা বলতে হবে না। বাড়ির কাছে বুড়ো এল, এম, এফ, ডাক্তার বসে। শুধু বসে থাকে। কেউ যায় না। পয়সা দিয়ে ফলস্ সার্টিফিকেট দেয়। আমি বলে একটা ম্যানেজ করে দেবো।

শ্বশুর বাড়ির লোক এত বোকা ?

আরে বিয়ে তো হচ্ছে পাটনায়, বলবি তাড়া থাকায় আপনাদের খবর দিতে পারিনি। আসলে মা—তো। একটা S.T.D. করতেও ভুলে গেছি। দশ দিনের মধ্যে বর যাত্রীদের শিখিয়ে নিয়ে যাবি।

—ওঁরা যদি বেঁকে বসে।

—আরে দূর তুই তো বিনা পণে বিয়ে করছিস। তার আবার দিনক্ষণ, মা বাপ ছাড়। ঠিক হয়ে যাবে।

—তারপর বৌ এসে তো দেখবে মা জ্যান্ত !
অন্যজনের পরামর্শ—পর চুলভাড়া কর এক রাতের জন্য।

—সে তো তিরুপতিতে পাওয়া যায়।

—তোমার মুণ্ডু।

কলকাতায় যারা ড্রেস ভাড়া দেয় তারাই দেবে।

মেকাপম্যানও পাওয়া যাবে।

—সেই ভাল।

—বিয়ে টু বৌভাত।

—তারপর দেখা যাবে।

—নতুন বৌকে সব ফ্রাংকলি জানাবি। মনের গোপন কথা ওপোন করে বললে তোকে ভালবেসে গ্রহণ করে নেবে।

—সব জানান যায় না। আগে যে একটার সঙ্গে লাইন ছিল তাও বলবো ?

—দূর মড়া তা বলতে যাবি কেন ? ফটো প্রেমপত্র সব আছে ?

—হ্যাঁ।

—পুড়িয়ে ফেল শিগগির।

—রিকস আছে কিন্তু ?

—তবে রিক্সায় চড়ে যাও হনুমান। বিয়ে হলে গেলে সব মিটে যাবে। মা মরার কথাটা আর তুলতে হবে না। পরের দিন ভোর ভোর বেরিয়ে পড়বি। দিনে পরচুল বোঝা যেতে পারে। নিজের বাড়িতে সব খুলে বলবি।

—কান্না পাচ্ছে রে।

—তবে কাঁদ।

ইন্টারভিউ

হরি রিক্সা টানে। ওর বউ-এর ইচ্ছা ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াবে। বেশ কেমন টাই বেঁধে গাড়ি চড়ে যাবে। কিন্তু প্রথমেই তো মৌখিক পরীক্ষা। ছেলে একে তোতলা তাই আবার খনা। নাকি সুরে কথা বলে। বাড়িতে ম্যাডাম রেখে ইংরাজি ট্রানস্লেসন শেখান হয়েছে। ৫ম থেকে অষ্টম বিভিন্ন শ্রেণীর পাশ সারটিফিকেটও সংগ্রহ করা আছে। কিছুটা মেদিনীপুর থেকে, বাকিটা দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে। হরি ঐ দুটি জায়গাতেই অতীতে বহু ফলস ভোট বা ছাপ্পা ভোট দিয়েছে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নানা জিনিস ম্যানেজ করেছে। এমন কি ছেলের জন্য ফলস সার্টিফিকেটও একাধিক সংগ্রহ করে ফেলেছে। এ ব্যাপারে হরি মাষ্টার।

ছেলের বয়স হয়েছে। দেখতে নাটা, বুদ্ধি রাখে। কিন্তু ভীষণ ফাজিল। বরানগরের একটি নাম করা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ওকে নির্দিষ্ট তারিখে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েকটা ট্রানস্লেসন দেয়া হল। যথা

(ক) ছেলেটি একশটি কলম চুরি করেছিল।

(খ) রাজমহিষী রাজাকে প্রণাম করিল।

(গ) ঘুড়িতে ঘুড়িতে প্যাঁচ হচ্ছে।

(ঘ) ভোলা ড্রেনের ধারে বসে ছোলা খাচ্ছে।

(ঙ) রাম হিমালয়ে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল।

(চ) ভারতীয় একজন বীর জাপানে গিয়ে নিরুদ্দেশ হন।

(ছ) ঘুড়িটি লাট খাইতেছে।

(জ) ডানকুনিতে আমাশার ওষুধ পাওয়া যায়।

(ঝ) স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় ?

(ঞ) ভাই ফোঁটার দিনটি ভাল।

ছেলেটি দ্রুত গতিতে লিখতে শুরু করেছিল।

(ক) The boy made century by pen.

(খ) The female buffelo of the king saluted the king.

(গ) Kite kite fight fight.

(ঘ) Bhola eating chola by the side of Nala.

(ঙ) Going to Himalay Ram went to Jamalay.

(চ) One Indian Hero became zero going to Japan.

(ছ) The kite is eating governor.

(জ) At Dankuni you can find thankuni

(ঝ) No body No body.

(ঞ) The brother droping day is very good.

ছেলেটির উপস্থিত বুদ্ধি দেখে পরীক্ষকদের চোখ ছানা বড়া। কেউ বা মন্তব্য করলেন—ভবিষ্যতে ভানু ব্যানার্জী হবে। বলা বাহল্য ঐ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তার ভর্ত্তি হওয়া হয় নি।

* * *

তারপর বাংলা মিডিয়ামের পেছনে দৌড়। বাংলা মিডিয়ামে পড়ার জন্য হরির বগলে একটি এইট পাস সার্টিফিকেট ছিল। অনেক ধরা করা করে একটি চান্স পাওয়া গেল। এইট পাশ হলে তো আর এইটে ভর্ত্তি করা যায় না। কাজেই সেভেন।

* * *

ছেলেটির দাদা নাইনে পড়ে। পড়া শুনে মনে রাখতে পারে।

ক্লাশ সেভেনে যে ধরণের প্রশ্ন হয় সেই প্রশ্ন কর্তা স্যার দু চারটি প্রশ্ন করেন। ছেলেটি নিরুত্তর থাকে।

প্রশ্ন—ব্যাকরণ কি পড়েছ ?

উত্তর—সন্ধি।

প্রশ্ন—বলোত কচু + আলু + আদা + আমড়া।

উত্তর—কচ্চালু লাদামড়া।

প্রশ্ন কর্ত্তা হেসে বলেন—সন্ধি হয় না। কিন্তু তোমার উপস্থিত বুদ্ধি ভাল।

ছেলেটি—দাদা নাইনে পড়ে ওর পড়া শুনি।

প্রশ্ন—কেন ?

উত্তর—শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা ভাল লাগে।

প্রশ্ন—ব্যাপারটা বলতে পার।

উত্তর—পারি।

প্রশ্ন—বল কেমন বুঝেছ।

উত্তর—রাজা দুষ্মন্ত স্বর্গ থেকে দেবতাদের (খেপ যুদ্ধ, খেপ খেলার মত) হয়ে যুদ্ধ করে ব্যাক করার সময়ে কণ্ব মুনির আশ্রমের কাছে ব্রেক জার্নি করে কিছুক্ষণ হল্ট্ করেন। ওখানেই শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর লাইন হয়। একটি আংটি উপহার দিয়ে তিনি নিজ রাজ্যে ফিরে যান। অনেকদিন কোন কানেকশন না থাকায় একদিন শকুন্তলা নিজেই রাজার সঙ্গে দেখা করে একটা হেস্ত নেস্ত করতে যান। দুষ্মন্ত আইডেণ্টিটি কার্ড দেখাতে বলেন। আইডেনটিটি হল একমাত্র আংটি। সেটি লস্ট। রাজা দুষ্মন্ত তাঁকে অপমান করে খেদিয়ে দেন। শকুন্তলা আই-ডেনটিটি হারিয়ে ফেলায় রাজা তাঁকে কনসাল্ট করে ইনসাল্ট করার চান্স নেন।

এদিকে শকুন্তলার ছিল হেভি রেলা। তিনি তো ফলস

দেননি। অগত্যা দীর্ঘ খিচাইনের পরে তিনি কম্বমুনির ফ্ল্যাটে ব্যাক করেন।

প্রশ্ন কর্তা শিক্ষক ছেলোটর ভাষা জ্ঞানে বিমুগ্ধ হয়ে তাকে অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে পাঠান। ভূগোল শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেন—কয়লা কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর—গোপালদার গোলায়।

প্রশ্ন—বায়ুমণ্ডল কাকে বলে?

উত্তর—মণ্ডল পাড়ার ওপর দিয়ে যে বায়ু বয়ে যায়।

প্রশ্ন—বি. জে. পি কথার মানে কি?

উত্তর—পদ্মফুল।

অঙ্কের প্রশ্ন—কি. মি ও ব. মি কথা দুটির মানে কি?

উত্তর—ক্রিমি হলে বমি হয়।

অবশেষে ছেলেটির প্রশ্ন—ষাঁড় আমাকে নেবেন তো?

প্রশ্ন—কিরে আমাদের ষাঁড় বলছিস কেন?

উত্তর—সর্দিতে নাক বুঝে গেছে।

অবশেষে তিনজন শিক্ষক সলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্তে এলেন। হরি গরীব কিন্তু আমাদের পার্টির এ্যাকটিভ সাপোর্টার অতএব···হরিকে ডাকা হল।

প্রশ্ন—টাকা এনেছ?

উত্তর—হাঁ।

প্রশ্ন—ডেট অফ বার্থ মানে জন্ম তারিখ?

হরি—যে বছর খুব ঝড় হয়েছিল।

প্রশ্ন—কালকে জেনে এসো। ফরম নিয়ে যাও।

কার্তিক পুজোর আউট পুট

হরেনের বেটা নরেন। আদি নিবাস খুলনায়। পশ্চিমবঙ্গের মতই ধরণ ধারণ যশোহর খুলনার মানুষ জনের। হরেন শিক্ষক ছিলেন। ছেলের লেখা পড়ায় মন নেই। কখনো মুরগীর পোলট্রি করে। লস খেয়ে গিয়ে আবার অটো চালায়। হরেন বাবুর বন্ধুর পরামর্শ---ইংরাজি অংক না জানলে ভদ্র সন্তানের চাকরি হয়না। ওকে আবার পড়াও। ভীষণ প্রতিযোগিতার মার্কেট। ভবিষ্যতে যদি লরিও চালায় তবে নর্থ ইণ্ডিয়াতে হিন্দি মাস্ট।

* * *

নরেন ঐ বাংলার যা কিছু ভাল তা বর্জন করেছে। এই বাংলার যা কিছু ভাল তাও গ্রহণ করতে পারেনি। ও যেন 'স্বয়ম্ভু'। ক্লাশ এইটে একবার পণ্ডিত মশাই সংস্কৃত ট্রানস্লেসন লিখতে বলে বোর্ডে লিখে দিয়েছিলেন—

দশরথের চারটি পুত্র ছিল।

নরেন দৌড়ে গিয়ে বোর্ডে লিখে এল।

—দশরথস্য চৌবাচ্চা। সেবার পণ্ডিত মহাশয়ের 'হাসমার' (হাসি+মার) খেয়ে বাছাধনের তেমন শিক্ষাও হল না। প্রবল অশান্তি হলে দু একদিন ক্লাবরুমে অথবা বন্ধুদের বাড়ি কাটায়। পরে আবার বাড়িতে ব্যাক করে। চিরদিন কে ওকে খাওয়াবে? বাহ্যতঃ বাবাকে খানিকটা ভয়ও করে। অনিচ্ছা সত্বেও বাবার চাপে হিন্দীর নাইট ক্লাসে ভর্তি হয়। কিছুদিন ক্লাস হয়ে যাবার পরে একদিন পণ্ডিতজি মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছিলেন।

প্রশ্ন—ডেথ সারটিফিকেট।

উত্তর—মৃত্যুকা পরোয়ানা।

প্রশ্ন—নেকটাই।

উত্তর—কনঠিকা লেংটি।

প্রশ্ন—এ প্লাটফর্ম থেকে ও প্লাটফর্ম।

উত্তর—ই লাট ফর্ম সে উলাট ফর্ম।

শেষ প্রশ্ন—আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ তলে।

উত্তর—মেরা শির পটক দে তেরা টেংরি পর।

পণ্ডিতজির হাসি তিরস্কার সব মিলে একাকার। বললে—রাস্তায় বাতাচজ হিন্দীতেই করতে।

* * *

একদিন সামান্য বৃষ্টি হচ্ছিল। নরেন দেখলো দোকানের সেডের তলায় জনৈক সহপাঠিনী দাঁড়িয়ে। নরেন চিৎকার করে ডাকলো—মেরা ছাত্তি পর আ যাও। ওর বুকের বোতাম খোলা ছিল। মাচার ছেলেরা ওর চেনা, নয়ত বহুত খিঁচাইন হতে পারতো।

—বাড়িতে হিন্দুস্তানী দুধওলা এসে দাম চাইল।

নরেন—বাবা নেই হ্যায়।

—ফজুর মে আয়েগা ?

—মতলব, যা ভাল বোঝেগা তাই করেগা।

ওদের পাশের বাড়ির ভদ্রলোক মারা গেছেন। সদ্য বিধবা মা আর মেয়ে। হরেনবাবুই ওদের দেখা শুনা করেন। অন্য পাড়ার বখা ছেলেরা মেয়েটাকে রাস্তায় টিজ করে। মাঝে মধ্যে বাড়ি চড়াও হবারও চেষ্টা করে। নরেন ওদের লোকাল গার্জেন। ওর সাফ কথা।

—ফিন যব ও সব আদমী আয়েগা আচ্ছা কসে দু চার ঘা দে দেগা।

—ঠিক আছে।

নরেনের জ্বর হয়েছে। বাবার বন্ধু ডাক্তার বাবুর চেম্বারে গেছে। জনৈক হিন্দুস্তানী পেসেণ্ট এসেছে। চোখে ব্যাণ্ডেজ। কি ভাবে থাকতে হবে জানতে এসেছে। চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে। ডাক্তারবাবু নরেনকে বাংলাতে সংক্ষেপে বলে দিলেন। বলেন—ওকে বুঝিয়ে দে।

বাথরুমে যাবার তাড়া ছিল।

নরেনের ডায়ালগ—সুবসে সাঁঝ থাকেগা অন্দর কা মাঝ। আঁখমে রোদ্দুর লাগেগা তো বেকায়দা হো জায়েগা। ঠিক আছে?

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি প্যাণ্টের চেন টানতে টানতে হেসে বল্লেন—এই তোর হিন্দি। দূর হ হতভাগা।

* * *

ডাক্তারবাবুর পরামর্শে হরেনবাবু ছেলেকে হিন্দি স্কুল ছাড়িয়ে দিলেন। বাজে পয়সা নষ্ট করে লাভ নেই।

* * *

শীতের মরসুমে ডাক্তারবাবু সস্ত্রীক নলবনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দেখলেন নরেন হাতে জ্বলন্ত সিগরেট নিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে বোটে উঠছে। মুখে প্যারোডি গান।

—হারে রে-রে, রে রে।

যেমন ছাড়া রয়েল বেঙ্গল সুন্দর বোনে তেরে।

গানের গলা আছে। বলা বাহুল্য নরেন কিন্তু ডাক্তারবাবুকে দেখতে পায়নি।

* * *

পরের দিন বাজারে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হরেনবাবুর।

ডাঃ—ছেলের বিয়ে দিন।

হরেন—কেন, কিছু দেখেছেন।

ডাঃ—না, ম্যারেজেবল এজ তো।

হরেন—কিন্তু বেকার তো।

ডাঃ—পার্টনার জুটিয়ে ফেলেছে কিন্তু। প্লিজ আমার রেফারেন্সে কিছু বলবেন না।

—ঠিক আছে।

*   *   *

অন্য একদিনের কথা। একদল ছেলে এসে হাজির হরেন-বাবুর সামনে। সকলেই ছেলের ইয়ার দোস্ত।

—কি ব্যাপার।

—চাঁদা দিন।

—অগ্রহায়ন মাসে কিসের চাঁদা?

—সম্মিলিত ইঁতু পুজো।

—তোমার লিডার কোথায়?

—ও শিয়ালদায় গেছে ঢাকি ঢুলি আনতে।

*   *   *

তারপর ছেলে বেপাত্তা। মাঝে মধ্যে এমনি করে। এখন আর উৎকণ্ঠা হয় না। কাছে পিঠেই থাকে। আবার বর্ষাকালের শুশুকের মত ভেসে ওঠে। খবর এলো নরেনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা বিমর্ষ। মায়ের কান্না।

—দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। মায়ের আক্ষেপ—যতই বল মন থেকে বাদ দিতে পেরেছ?

—আমি পারি।

—আমি পারি না।

—না পারলে কষ্ট ভোগ কর।

কাছে পিঠেই থাকে। খবর আসে।

*   *   *

দীর্ঘ ছ মাস পরে একদিন নাটকীয় ভাবে নরেনের আবির্ভাব। সঙ্গে বৌ বাচ্চা।

নরেন বৌকে উদ্দেশ্য করে বলল—এই আমার বাবা মা প্রণাম কর।

মা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল—থাক থাক অনেক হয়েছে। নরেন তুই দেখাই লি বাপ আমার।

হরেনবাবু গম্ভীর।

— তোর কোলে কে ?

নরেন—কার্তিক পুজোর আউট পুট।

—ডেঁপো কোথাকার।

শাককে শাক, পাছায় মুলো।

হরেনবাবু—চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা এখুনি।

নরেনের ডায়ালগ—ড্যাডি মুঝে মাপ কিজিয়ে। পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গিয়ে মজা দেখছে।

—বাবা এবার ভাবছি লেখাপড়া করবো। তুমি মাষ্টার ছিলে। ইংরাজী অংকটা তোমার কাছেই দেখবো।

হরেন—আগে বিয়ে, তারপর লেখাপড়া, বৃদ্ধ বয়সে চাকরি। দূর হ সামনে থেকে।

*　　*　　*

বৌটি এবার স্বমূর্তি ধরলো।

—অত তেলাচ্ছ কেন। এমন বাপমা দেখিনি। আগে জানলে নমস্কারও করতুম না।

—বটে।

নরেন—ঠিক আছে। যাচ্ছি।

মা চীৎকার করে বলল—তুই দুবেলা দুমুঠো খেয়ে যাস বুঝলি। আর ঐ রাক্ষসীটাকে আনবি না কোনদিন।

নরেনের শেষ কথা হিন্দী সিনেমার নায়কের মতো—কার্তিক পুজোর আউটপুটটাকে আনবো। প্লিজ একটু রিবেট দিও, এ দিল মাঙ্গে মোর।

রোদ্দুর ও বৃষ্টি

ছেলেটির নাম রোদ্দুর, মেয়েটি বৃষ্টি। একত্রে উভলিঙ্গ (কোয়েড) কলেজে পড়তো। একসঙ্গে কফি হাউসে যেত। এই ভাবেই ঘনিষ্ঠতা। মেয়েটির বাবা ভাল চাকুরে। গাড়ি আছে। ছেলেটি পড়াশুনায় অমনোযোগী। লেখাপড়া শেষ পর্যন্ত হোলনা। অগত্যা মোটর ড্রাইভিং শিখলো। মেয়েটি অনায়াসে গ্র্যাজুয়েট হল। কিন্তু অনার্সে কম নাম্বার থাকার জন্য এম, এ. তে চান্স পেলনা।

* * *

বৃষ্টির বাবা মেয়ের জন্য সুপাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। খবরের কাগজের বক্স নং দেখে জুটেও গেল একটি। পাত্র উচ্চ শিক্ষিত, ভালো চাকুরে। চেহারাটা কিন্তু গ্ল্যাক্সো বেবি মার্কা। তারপরে আবার বাঙ্গালী যুবকের দুটি অলঙ্কার, কিঞ্চিৎ টাক ও বেসামাল ভুঁড়ি। মেয়ের ঘোর আপত্তি। —ওকে বিয়ে করবো না। সাফ জবাব।

ইতিমধ্যে কায়দা করে রোদ্দুরকে সে বাপের গাড়ির ড্রাইভারে পরিণত করে ফেলেছে।

রোদ্দুরের চেহারা পেটান, শ্যাম চিক্কণ ও লোমশ। বৃষ্টির ওকেই পছন্দ। একসময়ে দুজনে গোপনে রেজেষ্ট্রিও করে ফেলে। খবর শুনে বৃষ্টির বাবার ষ্ট্রোক হল। পয়সা ছিল। কোনমতে সুস্থ হয়ে ফড়ে পুকুরের বাড়ি এবং গাড়ি বিক্রয় করে বেলঘরের একটি ফ্ল্যাটে চলে আসেন। বৃষ্টি রোদ্দুরের সঙ্গে জোট বেঁধে অন্যত্র বাসা নিল। ইতিমধ্যেই সে নিজের চেষ্টায়

একটা প্রাইমারী স্কুলে চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল। রোদ্দুর কিন্তু সহজে অন্যের গাড়ী চালানর চাকরি পেল না।

বৃষ্টির সাফ কথা। যতদিন চাকরি না পাও বাসা সামলাও। দিনের রান্নাটা অন্ততঃ করে রেখ। সকালে স্কুল না হলে নিজেই তো রান্না করতো। রাত্রে পার্টি অফিসে যেও। রোদ্দুর কার্ল মার্কসের ভক্ত, বৃষ্টি মা কালির। 'ক' এখানে কমন ফ্যাক্টর।

বাঙ্গালী সহ অবস্থানে বিশ্বাসী। সে বিষয় নিয়ে কোন গোলমাল নেই। বৃষ্টি বলে—আদ্যাপীঠে গেছ কখনো? রোদ্দুর—হাঁ, কেন?

—মূর্তি দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—কেমন বলতো?

—ঐ তো ওপরে রাধাকৃষ্ণ, মাঝে কালি আর তলায় রামকৃষ্ণ।

—ঠিক বলেছ। আমার মারও ত্রিমূর্তিতে বিশ্বাস। মার পুজোর ঘরে ঐ একই ভাবে সাজানো আছে।

—যেমন।

—ওপরে রামকৃষ্ণ, মাঝে জ্যোতি বসু, তলায় উত্তম কুমার।

—কি দিয়ে পুজো করেন ম্যাডাম।

—কেন জল বাতাসা।

—জিও ম্যাডাম, জিও।

* * *

একদিন ক্লাব রুমে বসে বন্ধুদের সঙ্গে মস্তি করতে গিয়ে রোদ্দুর চিকেনের চাট দিয়ে সত্তর টাকা দামের বোতলের প্রায় এক বোতল টেনে ছিল। ইয়ার বন্ধুরা ধরাধরি করে বাড়ি দিয়ে গেল। তারপর শুধুই বমি।

বৃষ্টিকে ডেকে বলছে—মা একটু ধরতো আমাকে।

বৃষ্টি রেগে আগুন।

—মা, হারামির বাচ্চা, বউকে মা ডাকছো ?

রোদ্দুর—ও সরি, মুখে মাপ কিজিয়ে।

বৃষ্টি—হিন্দীতে ডায়ালগ দেয়া হচ্ছে ?

তারপর থেকে রোদ্দুর আমাশায় ভুগছে। শুধুই বার্লি খায়। সঙ্গে থানকুনির রস।

সামনে পুজো। একদিন বৃষ্টি বেশ দেরি করে বাড়ি ফেরে।

—রান্না করে রাখনি ?

—না, মড়া আমি যন্ত্রনায় মরছি! কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি ? এত লেট কেন।

—পুজো মার্কেটিং করতে। দেখ না তোমার জন্য কি এনেছি।

—জাঙ্গিয়া ? আবার লাল রঙের কেন ?

—আরে শোন, করতো পার্টি। জান না লাল ঝাণ্ডা ওড়ালে টাটা, বাটার মত কারখানাকে বন্ধ করে দেয়া যায়। আর লাল জাঙ্গিয়া পরলে আমাশা বন্ধ হবে না ?

—ন্যাকামি করোনা বলছি।

—ন্যাকামি করিনি চান্‌কর।

অভাব অনটনের মধ্যে থাকলে মাঝে মাঝে দুজনের মধ্যে খিঁচাইন হয়। আবার মিটেও যায়। দাম্পত্য কলহের জের বেশিক্ষণ থাকে না।

অন্য একদিন।

—এই শোন কাল আমার বন্ধু সেবাকে খেতে বলেছি। রান্নার আইটেম বলে দিচ্ছি। কিন্তু ঘর দোর একটু সাজিয়ে রেখ কেমন। আর ভাল কথা দাড়িটা কামাবে। আলপিনের চারার মত কাঁচা পাকা দাড়ি বিচ্ছিরি লাগে। ফুল এনো কিন্তু।

আচ্ছারে বাবা আচ্ছা। বেশি জ্ঞান দিওনা। সব ঠিক ঠাক করে রাখবো !

বৃষ্টির অনুপস্থিতিতে ঝুল ঝাড়তে গিয়ে ঝুল ঝাড়া লাঠিটা ভেঙে গেল। বেলা হয়ে গেছে দোকান বন্ধ। রোদ্দুর ছ ফিট লম্বা। উঁচু একটা চেয়ারে উঠে ঝাকড়া এক মাথা চুল ঘোরাতে লাগল। অধিকাংশ ঝুল মাথায় উঠে এলো। তারপর তাড়াতাড়ি সেম্পু করে নিল। জানতে পারলে ঝগড়া করবে। ইতিমধ্যে মুগডাল, আলু ভাজা, মুরগীর মাংস ও টমাটোর চাটনী বানিয়ে ফেলেছে। বাড়ি ফিরে বৃষ্টি--বা ভেরি নাইস ! কিন্তু ফুল ?

—আরে এখানে লক্ষ্মী পুজোর গাঁদা ফুল ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। দেখনা সাইকেলে করে গোলাপ এনেছি আলম বাজার থেকে।

—একি শুকনো শুকনো কেন ?

—টাটকা পাইনি। এগুলো নিহত গোলাপ, দামও কম। ডজন মাত্র ছটাকা।

—তোমার মুন্ডু।

*   *   *

ভাগ্য ভালো কিছুদিন পরে রোদ্দুর একটা গ্যারেজে চাকরি পেয়ে যায়। আবার গাড়ি চালায়। স্কুলে যাবার সময় একদিন মেজাজ দেখিয়ে বলে—বাড়িতে এক ফোঁটাও কেরোসিন নেই। কেরোসিন তুলে রেখ কেমন।

রোদ্দুর—কেরোসিন তুলতে গেলে চাকরি কামাই করতে হবে তো ?

—ভারি তো গাড়োয়ানের চাকরি, তার ওপর আবার লেট কামাই ছাড়োতো।

—মুখ সামলে কথা বলবে। গাড়োয়ান কি কথা ! বলবে ড্রাইভার !

—ঐ হল আর কি বৃষ্টির প্রস্থান।

চাকরি কামাই করে সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে রোদ্দুরে দু লিটার তেল তুললো।

বৃষ্টি বাড়ি ফিরতেই রোদ্দুর ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল—চা কর।

বৃষ্টি—চা নেই, দেশলাই নেই।

রোদ্দুর—শুধু তুমি আছ বলিহারি।

দুজনে তুমুল ঝগড়া লাগলো। রাগের মাথায় রোদ্দুর বলে উঠলো—মরতে পার না।

বৃষ্টি—মরলে খুব ভালো হয় না, অন্য একটা মেয়েকে ধরে আনবে?

—হাঁ আনবো।

—ঠিক আছে মরছি।

এক দৌড়ে বৃষ্টি কেরোসিনের ক্যানটা নিয়ে বাথরুমের দিকে দৌড়াল।

রোদ্দুর—চাকরি কামাই করে, রোদে পুড়ে কোরোসিন তুলেছি! ভারি সখ কেরোসিন গায়ে ঢেলে মরার! যাও ঘুঁটে জেবলে মরগে যাও।

একটানে রোদ্দুর ক্যানটা কেড়ে নিলে বৃষ্টি হেসে ফেলল। কেসটা হাল্কা হয়ে গেল। সেদিনের মত সমাপ্ত।

* * *

পরের দিনের দৃশ্য। দুজনে বেশ সাজগোজ করেছে। রোদ্দুরের ঘাড়ে পাউডার। বৃষ্টির ঠোটে লিপষ্টিক। ইয়ার বন্ধুদের থেকে বাইক নিয়ে পেছনে বৃষ্টিকে বসিয়ে দুজনে রওনা হল। রোদ্দুরের মুখে সেই পুরানো আমলের ফিল্ম গান—

ছিছিছি বেটা কেয়া সরম কি বাত।

অন্দর লোককা লেড়কি ভাগে ডেরাইভারকো সাথ।

আড্ডার এক ইয়ার জিজ্ঞাসা করলো—

কি গো কত্তা গিন্নী মিলে কোথায় যাওয়া হচ্ছে।

রোদ্দুর—লগন, বৃাদার লগন দেখতে।

রোদ্দুর কালো, বৃষ্টি ফরসা। দুজনে মিলে বেশ কেমন আলো আঁধারি ভাব।

ঘড়ি ও চুড়ি

দুজনেই তাবড় নেতা। অবশ্য বিপরীত দলের। দুজনেই ক্ষমতাবান। একজন বহু জমি ও টাকার মালিক। অতএব জমিদার। অন্যজন পুকুর বোজান, বেআইনি ফ্ল্যাট নির্মাণ ও তোলাবাজিতে মাষ্টার পিস। কেউই জমাদার নন। দুজনের নামেই নানা অভিযোগ। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেনা। দুজনেরই অনেক চ্যালাচামুণ্ডা আছে। একজন উঠতি, অন্যজন পড়তি।

* * *

বর্ত্তমান প্রজন্মের ছেলেরা বিশ্বযুদ্ধ দেখেনি। স্বাধীনতা আন্দোলন বোঝে না। '৭২ জানতে চায় না। সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ড জানেনা। এসবে তাদের অনীহা। ওসব ওদের কাছে ভাঙা রেকর্ডের মত অর্থহীন। যা কারেণ্ট তাতেই ওদের আগ্রহ। ক্রিকেট, কেরিয়ার, মাচা, ক্লাব, বারোয়ারী পুজো, সেলোফোন, ক্যাসকার্ড, কনডাকটেড টুর—এই সব নিয়েই ব্যস্ত এ কালের ছেলেরা। সিনেমা তো আছেই। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু তারা সংখ্যা লঘিষ্ঠ। নেতারা যা করে, ক্যাডাররা ততটা এগোতে পারে না। পারলে লিডার বনে যেত। যারা ডেপুটি লিডার তারা বোতল সাপ্লাই দেয় ক্লাব প্রতিষ্ঠানে, পুজোয় মোটা চাঁদা দেয় ছেলেদের হাতে রাখার জন্য। জীবন্ত মানুষকে ঘরে আটকে রেখে পুড়িয়ে মারে। জমি বা ভেড়ির দখল নিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়। বরযাত্রীর বাস আটকে লুঠ ও ধর্ষণ করে। হোটেলে বসে গুণে গুণে নোট নেয়। নিষিদ্ধ পল্লীতে গিয়ে রাত কাটায়। এর জন্য এরা নেতাদের কাছে ট্রেনিং প্রাপ্ত। ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল প্রভৃতিতে এদেশ এলাকা ভিত্তিক। যার যেখানে

অর্থ, পেশি আর ক্যাডার বেশি তার সেখানেই মার্কেট। ভারতীয় গণতন্ত্র ক্ষেত্র বিশেষে বোকা বনে যায়। পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচনে একই চিত্র। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে না করে ধর্ষণ করে কিছু যুবক জেল ঘরে যায়, পরে বেকায়দায় পড়ে বাসর ঘরে যায়। আইন এদের জন্য। কিন্তু নেতারা বাড়িতে বিবাহিত স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্যত্র একই খেলায় অভ্যস্ত হলে আইন বোবা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আইন, আদালত, পুলিশ সবই বোবা।

*　　　　*　　　　*

যাক এসব কথা। একটা গল্প বলি শুনুন। ঐ দুজন তাবড় নেতার কাহিনী। যিনি লোকাল তিনি একটু বেশি ভোকাল। এলাকার ভূগোল তার নখদর্পণে।

যিনি বাইরের তিনি যেন অনাহূত, রবাহূত। অসুবিধেটা তাঁরই বেশি। লোকাল নেতাটির নাম ক, বাইরেরটির নাম খ। ক খ এর লড়াই। ও এঁরা ইণ্ডিপেনডেণ্ট। তাদের ওপর কেউ ডিপেণ্ড করে না। 'ক' ভোটের আগেই জিতে বসে আছেন। তবু ভোটারদের বিশ্বাস করেন না। তারা তো মানুষ। যদি উল্টো পাল্টা করে। একেবারে অমানুষ হলে ভালো হত। তাই ছাপ্পা ভোট ও বুথ দখলের মাষ্টার 'ক' সকাল থেকেই ত্রাণকার্য শুরু করে দেন। রিগিং এর জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখনো ডক্টরেট উপাধি চালু করেনি। করলে 'ক' অন্ততঃ অনায়াসে লাভ করতেন। 'খ' তাঁর অবস্থা অনুমান করতে পেরেছেন।

*　　　　*　　　　*

খ সোজা গাড়ি নিয়ে 'ক' এর অফিসে ঢুকে পড়লেন।

ক—আসুন আসুন, চা খান।

খ—চা খেতে আসিনি। জানি আপনি জিতে গেছেন। কিন্তু এটা হচ্ছেটা কি ?

ক—কি বলুন তো ?

খ—বুঝতে পারছেন না ?

তারপর পাঞ্জাবীর হাতাটা গুটিয়ে দেখালেন। এটা কি বলুন তো ?

ক—ঘড়ি।

খ—হাঁ ঘড়ি, চুড়ি নয় মনে রাখবেন।

একজন গুম, অন্যজন খুস ।

কাউনটিং এর দিনে ক অনুপস্থিত।

খ আগে থেকেই মালা পরে ফাগ মেখে ভোর থেকেই উপস্থিত।

নাটার প্রেম

ছেলেটির নাম সন্দীপন। বড্ড বেঁটে বলে পাড়ার সকলেই ওকে নাটা বলে ডাকে। পাশের বাড়ির সন্দীপ্তা ওর বান্ধবী। নাটা বেকার, কিছু টুশানি করে। চাকরি কোথায়? এখন কনট্রাক্ট সার্ভিসের যুগ। চাকরি বাকরি ভোগে গেছে গিয়া। তাও আবার বিশেষ ধরণের যোগ্যতা চাই। তবে মেয়ে নিয়ে ঘোরা কেন? ওটা যৌবনের স্বভাব ধর্ম। বাবাকে তো এসব বলা চলবে না।

* * *

দাদুর মুখে নাটা শুনেছিল আরিয়াদহ ঘোষাল খামারের উত্তর দিকে বিরাট আম লিচুর বাগান ছিল। ছেলেরা ঐ জঙ্গল দিয়ে ড্রেন টপকে ফুটবল গ্রাউণ্ডে গিয়ে খেলা দেখত। তখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, প্রভৃতি ছিল। বেলুড় মঠ, কালীবাড়ি ছিল। ছিল না নলবন। হাতে পয়সাও ছিল না আজকের ছেলে মেয়েদের মত। ল্যাম্পপোষ্টের ধারে সাইকেলে ঠেস দিয়ে আলো আঁধারি কোন জায়গায় মিলিত হবার চল হয়নি। তাই ঐ বাগানটার মধ্যেই প্রেমিক প্রেমিকারা নিভৃতে গল্প গুজব করত। আরিয়াদহের ইতিহাসে তাই ঐ বাগানের নাম দেয়া হয়েছিল 'পিরিতকানন'। দাদু খোলা মনের মানুষ। বললে— তোর বাবাও একজনের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল। বিয়ে দিতে বাধ্য হই। তুই তাদের প্রোডাক্ট। আনন্দে উল্লাসে নাটা দাদুকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খায়।

—কেয়াবাত।

—সাবধান বাবাকে বলিস না যেন।

—ক্ষেপেছ।

*　　　　*　　　　*

দাদু আরো গল্প শোনাল। ওর বাবার ছুটফটানির গল্প। নতুন চাকরি। সবে জয়েন করেছে। জানিস ভাই একদিন বেলা ২টা নাগাদ বাড়ি ফিরে বলল আমার মাথা ধরেছে। বলেই দোতালায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। মাঝে রাত ৯টা নাগাদ একবার খেতে উঠেছিল। আবার বিছানায়। রাত দশটায় ওর মা ও বৌ যখন খাচ্ছে তখন চিৎকার করে উঠলো—বালিশ কোথায় বালিশ। এবাড়িতে অসুখ করলে কেউ কারুর মুখ চায় না। আসলে মাথা ধরাটা অভিনয়। বৃদ্ধ পিতা সেটা বুঝেই বললেন—বালিশ খাচ্ছে। খাওয়া হলেই যাবে। ওপরের দিকে মুখ করে বেশ একটু জোরেই বললেন। নতুন বউ লজ্জায় মাথা নিচু করে গপ্ গপ্ করে গিলতে লাগলো। সন্দীপনের সেকি মজা। দাদু নাতিতে মধুর সম্পর্ক।

জিও দাদু জিও। ট্রাডিশান চলছে, চলবে।

*　　　　*　　　　*

সন্দীপনের উচ্চতা ৪ ফুটের কিছু ওপরে। সুদীপ্তা প্রায় ৬ ফুট। দুজনেই দেহের হ্রস্ব দীর্ঘ নিয়ে বিরক্ত। বিয়ের বাজারে মার্কেট নেই। কেউ পছন্দ করে না। দুজনেই হীনমন্যতায় ভোগে। দুই পরিবারেও প্রবল আপত্তি। ছেলে বেঁটে এবং বেকার। মেয়ে অসম্ভব লম্বা এবং কালো। সন্দীপনের বাবা একদিন ছেলেকে উল্টো পাল্টা চার্জ করে। বেকার। বাড়ির কোন কাজে নেই, শুধুই ছোঁক ছোঁক করা।

ছোট ভাই বোনেদের সামনে চার্জ করায় সন্দীপনের মাথা গেল গরম হয়ে।

—দেখ বাবা বেশি মাজাকি কোরোনা। তোমারও হিস্ট্রি আমি জানি।

—কে বলেছে।

—বই পড়ে জেনেছি।

—তোর বাক্স থেকে আমি অনেক চিঠি পেয়েছি।

—কচু পেয়েছ। ও সব ফলস্। চক্রান্ত। তোমাদের যুগে চিঠি লেখা থাকলে তুমিও লিখতে।

—চোপ। দূর হ বাড়ি থেকে। তোর জ্যান্ত মুখ আমি আর দেখতে চাই না।

—কি বল্লে! বটে। আচ্ছা।

নাটা এক দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

*   *   *

উত্তেজিত মা ও ভাই বোনেরা ঘণ্টা দুয়েক পরে খোঁজাখুঁজি শুরু করে।

ওর ঠেকে যায়। কিন্তু ওর বাবা নির্বিকার। বাপের মুখের ওপর যা নয় তাই বলে গেল। মরুকগে।

*   *   *

প্রথমে গেল বালি ব্রীজে। গরম কাল। দেখলো ব্রীজের তলায় ছেলেরা চড়ার ওপর ফুটবল খেলছে। তারপর আলম বাজারের আফিংএর দোকানে। দোকানদার ওর বাবার চেনা। ছেলেটির উত্তেজিত ভাব দেখে দোকানদার যথার্থ দাম নিয়েই ভেজাল আফিং দিল। খেয়ে ফেলেছিল সবটাই। তারপর নার্ভাস হয়ে রিক্সা নিয়ে বাড়ি আসে। বাবা অফিসে। মাও পাড়ার ছেলেরা সাগরদত্ত হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। বমি হতে থাকে। ইনজেকশনও চলে। সামলে যায়।

*   *   *

এক সপ্তাহ পরের কথা। কালীবাড়ির পঞ্চবটিতে মেয়েটি অপেক্ষা করছিল। অ্যাপয়েনমেণ্ট করাই ছিল।

মেয়েটি বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। নাটা বড় সাইকেলে হাফপ্যাডেল করতে করতে চলে আসে। পা পায় না।

—মরতে যাচ্ছিলে কেন ?

—আমার ইচ্ছা।

—আমার কথাটা একবার ভাবলে না ?

—ভেবে লাভ কি? বিষ খেলুম কিন্তু বেঁচে গেলাম। পেনালটি হল অথচ গোল করা গেল না। এই আর কি ?

—মরতে হলে দুজনেই মরবো। মেয়েটি বলল। চল আজই চল।

নাটা—আজ টুশনির পেমেণ্টটা পাবো। কাল দেখা যাবে।

সুদীপ্তা—কাপুরুষ !

সন্দীপন—তুমিও মহাপুরুষ নয়। ছাড় ওসব। ডাল কচুরী খাওয়াবে ?

—চল।

সন্দীপনের প্রবল ইচ্ছা আলো আঁধারির সুযোগে একটি কিস করে। কিন্তু নাগাল পায়না তো। লাফিয়ে উঠে তো আর চুমু খাওয়া যায় না। এক সময়ে একটু আধটু রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চা করেছিল। হঠাৎ সুরেলা গলায় বলে ওঠে—ওলো সই ওলো সই হাতের কাছে থাকত যদি একটি মাত্র ইলেকট্রিকের মই।

মরা আর হোল না দুজনের। বাঁচাও মুস্কিল। রাত ৯টা নাগাদ পুলিশ এসে তাড়া দিল। চলে যান চলে যান। অনেক হয়েছে। পেপারমিলের কাছে জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ইশারায় সুদীপ্তাকে সরে যেতে বলল।

ভদ্রলোক—এই নিন আপনার পেমেণ্টটা।

সন্দীপন পেমেণ্ট নিয়ে বলল—কিছু মনে করবেন না। সপ্তাহ খানেক অসুস্থ ছিলাম। সোমবার থেকে রোজ পড়াব। হ্যাঁ রবিবারেও ছাত্র যেন ক্যারাটে শিখতে না যায়। আমি যাব।

অভিভাবক—ঠিক আছে।

ভাগ্যিস ব্যাপারটা জানাজানি হয়নি। তাহলে তো কেলো হত। ভদ্রলোক চলে গেলেন।

সন্দীপ্তা এগিয়ে এলো।

—তুমি টাকাটা রাখ।

—কেন ?

—আমি বাবার পকেট থেকে বিড়ি ঝেড়ে খাই।

—বাবাও আমার পকেট হাতড়ে কিছু ম্যানেজ করে।

দুজনে মেজায় খুশী। দুজনেই গান ধরলো গুণ গুণ করে। রবীন্দ্রনাথের সংকোচের বিহ্বলতার প্যারোডি।

শঙ্খচিলে ডিম পেড়েছে
ছাগলে দেয় তা
শঙ্খচিলের ডিমগুলোর ছাগলের মত পা।
ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যা

ছাগলে আর আ-আ-আ বলতে পারে না।

খোকা ও বুড়ো

বয়স কমিয়ে বলা বাঙ্গালী চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে। প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ বিজয়া দশমীর দিনে আমাকে প্রণাম করতে এলেন। বললাম—একি আপনি সিনিয়ার, আমাকে প্রণাম করবেন না। ছিঃ ছিঃ। জবাবে বললেন, আপনি ব্রাহ্মণ, তাছাড়া বয়সে বড়। আপনিই তো নমস্য। কথা না বাড়িয়ে মিষ্টি মুখ করালাম। বৃদ্ধ, রুগ্ন, অবসর প্রাপ্ত, প্রায় শ্মশানমুখী তাঁরা কেন বয়স কমিয়ে বলেন বুঝিনা। লাভ কি? গল্প চলে। একদিন বলেই বসলেন, বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন সব নিজের চোখে দেখা। '৪২ এর আন্দোলন-এর উনি জীবন্ত সাক্ষী। দিন বদল হচ্ছে, উনি একটুও বদলান নি। ভাল বাবা! বয়স কমিয়ে যদি লাভ হয় হোক না। অবশেষে তাঁর শেষ অবস্থা। শুনলাম ইনসেনটিভ কেয়ারে দেয়া হবে। সব ফেলে দৌড়ালাম। অন্তিম দৃশ্য দেখে আসি। তখনো সামান্য সামান্য জ্ঞান আছে। কখনও বা কথা বলছেন দু চারটে। কখনও অসংলগ্ন। আমাকে দেখে বল্লেন—বসুন।

চিনতে পারছেন।

উত্তর—হাঁ। আপনাকে বলে রাখি যদি কিছু হয়ে যায় বয়সটা একটু কমিয়ে সার্টিফিকেট বের করবেন। ছেলেরা ওসব বোঝে না।

আমি বললাম, ওসব কি বলছেন আপনি তো ভালই আছেন। আমি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি, বললেন সময় লাগবে কিন্তু সেরে উঠবে।

উত্তর—হাঁ এত অল্প বয়সে তো মরে না। বললাম—আপনার নাতির ছেলে হয়েছে শুনেছেন।

উত্তর—ওসব বাজে কথা। কতই বা বয়স ওর। তার আবার ছেলে।

আসলে বয়স না কমিয়ে উনি মরবেন না। ভাল বাবা!

ডাক্তারবাবু আমাকে বলেছিলেন রোগ বলতে ওর তেমন কিছু নেই। বয়সের ভার। জরা। এই সব রোখা যায় না। অবশেষে মারা গেলেন।

অন্য একটি চরিত্র। ঠিক বিপরীতধর্মী। উনি আবার বয়স বাড়িয়ে বলাতেই অভ্যস্ত। ভদ্রলোকের সুগার, প্রেসার, ইনসমনিয়া। বাড়িতে দেখতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন করলাম—বয়স কত হল।

উত্তর—বাহাত্তর।

লাফিয়ে উঠে ওঁর দাদা বল্লেন, বলিস কিরে, আমার সত্তর হলে তোর বাহাত্তর হয় কি করে?

উত্তর—তোমারটা তুমি বোঝ, আমারটা আমি, অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবে না। ইসারায় ওঁর স্ত্রী ভাসুরকে চুপ করিয়ে দিলেন। অন্য একদিন পাত্র পক্ষ মেয়ে দেখতে এসেছে। আগে থেকেই বাড়ির লোক ওঁকে সাবধান করে দিয়েছে তুমি কোন ব্যাপারে কিছু বলবে না। অসুস্থ তাই চুপ করে বসে থাকবে।

—ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে

পাত্রপক্ষ ওঁর মেয়ে দেখতে এসেছে। মেয়েটি সুশ্রী। বয়সের তুলনায় কচি কচি ভাব। পাত্রের পিতা জিজ্ঞাসা করলেন—মায়ের বয়স কত?

দুম করে কন্যার পিতা বলে বসলেন, ত্রিশ।

—দেখে মনে তো হয় না!

কন্যার পিসিমা বুদ্ধিমতী এবং বেশ ডোকাল।

উনি বললেন—না না ২৫। আসলে দাদার খানিকটা

ইনস্টেমিয়া হয়েছে। প্রায় ভুলভাল বলেন—এই দেখুন ওর সার্টিফিকেট।

পাত্রের পিতা বললেন—না-না সার্টিফিকেট দেখতে চাই না। মুখ দেখলেই বোঝা যায়। আমাদের মনেই হয়েছে ওঁর হিসাব সম্ভবতঃ ঠিক নয়। পাত্র পক্ষ বিদায় নিলে ভাই বোনে সে কি ঝগড়া!

বোন—দাদা তুমি তোমারটা যা খুশী বলবে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবে না। লোকে কোথায় কমিয়ে বলে, উনি আবার বাড়িয়ে বলছেন! ছিঃ। বোনের দাবড়ানি খেয়ে ভদ্রলোক চুপ হয়ে গেলেন।

* * *

বয়স নিয়ে প্রকৃতই কোন সমস্যা ছিল না। ছেলের বয়সও ত্রিশ। বিয়ে আনন্দের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়ে গেল।

ডায়ালগ-শিক্ষক বনাম ছাত্র

সুব্রত স্যার রিটায়ার করে পেনসন পান নি। টেকনিক্যাল গোলমাল। কবে মিটবে কে জানে। পেনসন নিয়ে টেনশনের জন্য উনি টুশানি করেন। সময়ও কাটে দুটো পয়সাও আসে। আগে কথামৃতর আসরে যেতেন। যিনি পাঠক ও ব্যাখ্যাতা তিনি পাঠের আগে ও পরে একালের ছেলে মেয়েদের আচরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল ইত্যাদি নিয়ে বিতর্ক করেন। সুব্রতবাবুর এসব ভালো লাগে না। তাই কার্যতঃ উনি নির্বান্ধব। ছেলেদের পড়ান, বোঝান। চা বিস্কুট খাওয়ান। ফলে ছাত্ররাও ওঁকে ভালবাসে। তবে হাঁ পেমেণ্টের খাতা মেনটেন করেন। মাইনে না দিলে সতর্ক করে দেন।

* * *

পড়ার পরে ছাত্রদের মজার মজার গল্প করেন। যেমন—বাবা—দাদা কি করে হয় ?

জানিনা স্যার। ও রকম ইকুয়েশন কোন দিন করিনি। আপনিই বলুন।

—তবে শোন। একদিন দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়িতে এসে জনৈক বাপ ও ছেলে মা ভবতারিনীকে পুজো দিল। প্রণাম করতে করতে দুজনেই বলল—মা। ফেরার পথে ছেলে বাবাকে বললো—দাদা ডাল কচুরী খাওয়াবে না ?

বাবা—ঠাকুর দর্শন করে পাগল হলি নাকি ? বাবাকে দাদা বলছিস কেন ব্যাপার কি ?

ছেলের উত্তর—বাঃ ঠাকুরকে তুমিও বল্লে মা, আমিও বললুম মা। মা যদি কমন হয় তাহলে তুমি আমার দাদা হলে না ? ভুল বলেছি ?

—প্রবলেম সল্‌ভড।

—বাড়ি চ দেখাচ্ছি মজা।

ছেলেরা হাঁসিতে ফেটে পড়ল।

সত্যিই তো বাবার আর স্বতন্ত্র আইডেনটিটি থাকে না।

*　　　*　　　*

স্যার আর একটা হয়ে যাক।

স্যার—আচ্ছা—দক্ষিণেশ্বর ষ্টেশনে এই মাত্র একটা ট্রেন থেমেছে। তাহলে আমার বয়স কত ?

ছাত্ররা তো অবাক। এ'কি প্রশ্ন!

—আপনিই বলুন স্যার।

—না তোমাদের বলতে হবে।

সবাই চুপ চাপ। হঠাৎ একটি ছেলে উসখুস করতে লাগল।

—বল।

—বলব স্যার ?

—হ্যাঁ।

—রাগ করবেন না তো।

—না।

আপনার বয়স ৬৪।

—কি করে জানলি ?

উত্তর—আমার বাবার একজন বন্ধু আছেন। উনি আধ পাগলা। ওঁর বয়স ৩২ বছর। আর আপনার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে আপনি ফুল পাগলা। কারণ ষ্টেশনে ট্রেন থামার সঙ্গে বয়সের সম্পর্ক আবার কি! তাই আমার মনে হয় আধ পাগলার বয়স ৩২ হলে ফুল পাগলার বয়স নিশ্চয় ৬৪।

প্রবল হাস্য ধ্বনির মধ্যে স্যার ছাত্রের পিঠ চাপড়ে বললেন—সাবাস বেটা।

নেক্সট প্রশ্ন—মানুষ বড় হয় কিসে ধনে, মানে না বিদ্যায়।

উত্তর—সম্বায় স্যার।

স্যার—থ্যাংক ইউ।

এবার স্যারের প্রশ্ন এবং উত্তর।

সম্প্রতি আমেরিকা থেকে একদল অপরাধ সমীক্ষকের টীম এসেছিল। ওঁরা বোম্বাইএ একদিন দিল্লীতে একদিন আর আলম বাজারে দুদিন ছিলেন সার্ভে করার জন্য। কেন বলতো?

—সত্যি স্যার?

—সত্যি। কেন বলতো?

আলম বাজারে ভদ্রলোক নেই? আছে, গুণ্ডা দমনও হয়ে গেছে। কিন্তু সত্তরের দশকে চেহারাটা ছিল উল্টো। এখন এলাকাটা শান্ত। এখন গুণ্ডারা ওখানে সংখ্যা লঘিষ্ঠ। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় তোলা বিজ্ঞানীরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। আর প্রোমোটাররা সারা পশ্চিম বঙ্গেই সর্বাধিক ক্ষমতা সম্পন্ন।

—আজ যা। কাল আবার বলা যাবে।

—যাচ্ছি স্যার।

জিগরি দোস্ত

ধীলন আর মিলন জিগরি দোস্ত। দুজনে খুব পেয়ার। ধীলন সিং পাঞ্জাবী। মিলন দাস বাঙ্গালী দুজনে বি. টি. রোডের এক গ্যারেজে একত্রে চাকরি করে। অ্যাডল্ট যুবক। হোলির দিন, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন একত্রে বোতল সেবন করে। ওদের কাছে ও দুটো দিন আসলে 'পান' দিবস। নামে কাজে ও চরিত্রে ত্রিবিধ মিলনের জন্য ওদের দোস্তী গভীর। একজন অন্যের জন্য জান লড়িয়ে দিতে পারে। ঘটনা চক্রে গ্যারেজটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুজনেই বেকার হয়ে গেল। রাতারাতি অন্য গ্যারেজে চাকরি মেলেনা। মিললেও দুজনের দরকার হয় না। দুজন একত্রে না হলে বেকার থাকবে, তবু স্বতন্ত্র ভাবে চাকরি করবে না। কেউ বাড়ির কথা শোনেনা, ভাবেও না। সাদি করার গল্প হলে দুজনেই একমত। একে বেকার তায় ম্যারেজ মানেই তো গ্যারেজ ; অর্থাৎ বাড়িতে আটকে পড়তে হবে। ওটা ওদের পছন্দ নয়।

* * *

পাঞ্জাবীরা সাধারণতঃ কেশ, কচ্ছ, বালা প্রভৃতি ধারণ করে। এই একটি ব্যাপারে ধর্মীয় নেতা, তাবড় রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতি সকলেই একমত। কিন্তু বিস্ময় কর ব্যাপার এই যে ধীলন পাগড়ি ও বালা পরে কিন্তু দাড়ি কামায়। একে ভাদ্র মাস, ভেপসা গরম তায় হাতে পয়সা নেই। অযত্ন লালিত দাড়িগুলো বেজায় চুলকাচ্ছিল। দুজনে মিলে ঠিক করে পরস্পরের একটা করে দাড়ি আলতো করে উপড়ে দেবে। যাতে বেশি না লাগে। সময় লাগবে কিন্তু কেশ উৎপাটন হবে। শর্ত হল দাড়ি

ওপড়াতে ওপড়াতে একজন করে মহাপুরুষ বা মনীষীর নাম বলতে হবে।

আরম্ভ হল কেশ উৎপাটন প্রতিযোগিতা। মিলন রবীন্দ্রনাথের নামে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে।

ধীলন উত্তর দেয় রঞ্জিৎ সিং এর নামে।

প্রতিযোগিতা চলতেই থাকে। দুজনেই বেশ মজা পায়। মাঝে মাঝে ধূম পানের বিরতিও থাকে। কিন্তু দুজনেই তো যুবক ছেলে। হেয়ার গ্রোথ খুবই বেশি। পিউবারটির লিবার্টি যাকে বলে। ধীলন এক সময়ে মনে মনে বিরক্ত হয়ে ভাবে, বাল ছিড়নে কো আস্তে কাল সুবা হো যায়ে গা। তাই বেপরোয়া হয়ে সে হঠাৎ বিনয়, বাদল, দীনেশ বলে পটাপট তিনটে মিলনের তিনটে দাড়ির চুল একত্র করে ছিড়ে দেয়। খুব লেগেছে মিলনের। রাগে উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে—তবেরে বেটা পাঁইয়ার বাচ্চা, বাঁধা কপি। দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। ক্ষিপ্ত মিলন ধীলনের সমস্ত দাড়ি একত্র করে জোরসে একটা পাক মেরে বলে ওঠে— জালিয়ানওলা বাগের হত্যাকাণ্ডের লক্ষ লক্ষ পাঞ্জাবী শহিদ বলেই মার টান দাড়ির গোছায়। প্রায় রক্তারক্তি কাণ্ড। ধীলন পালাতে চেষ্টা করলে মিলন তাকে জাপটে ধরে দাড়ি ওপড়াবেই। দোস্তির সঙ্গে মস্তি করতে করতে প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হয়ে গেল।

উঠতি যৌবন

রাস্তার সাইড বেদখল করা ক্লাব। নামটা সঠিক। ক্ষুদিরাম বা সুভাষ চন্দ্রের যৌবন এমনকি নকসাল আন্দোলনের যৌবন এখন এক ধরণের নষ্টালজিয়া। বর্তমান যৌবনের অন্য নাম ক্লাব কালচার। হয় সৌরভ, শচীন, নয় ঋতুপর্ণা, মাধুরী দীক্ষিত এই সব এখন চর্চার বিষয়। দোষটা ছেলেদের নয়। সামাজিক নেতৃত্বের। ভোট অথবা নোটের জন্য ওদের ভুলিয়ে রাখা দরকার।

* * *

উঠতি যৌবনের সম্মিলিত ইঁতুপুজো, অলবেঙ্গল ঘেঁটুপুজো, গণ সত্যনারায়ণ পুজো ইত্যাদি লেগেই আছে। কালীপুজো তো মাষ্ট। গণ আইবুড়ো ভাতের প্রস্তাবও ওদের চিন্তায় আছে। এক সঙ্গে ডজন খানেক মেয়ের অভাবে প্রস্তাবটা মুলতুবী আছে। শোনা যায় দেশে নাকি ধূম পানের প্রকোপ কমেছে। কিন্তু ক্লাব=বোতল এই দৃশ্য ক্রমশই বর্ধমান। গভীর রাতে রোল হাতে জাঙ্গিয়া পরে হিন্দী ফিল্মী গানের তালে টুইস্ট অথবা ব্রেকডান্স চলে, দিনে সকলেই স্বাভাবিক। ক্লাব করে অথচ 'জল' খায় না যারা, তাদের পেনালটি দিতে হয়। এটাই তো ক্লাব কালচার। সংখ্যালঘিষ্ঠরা তাস বা কেরাম খেলে নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি ফেরে। ইনডোরের ব্যবস্থা ও টেলিভিষণ সর্বত্রই আছে।

গভীর রাতে আপনার বাড়ি তৈরীর ইঁট, সিমেন্ট, রড ঝেড়ে নেবে। ক্লাবরুম মানেই সাইকেল, বাইক, মদ, মোবাইল, টিভি।

প্রোমোটাররা প্যাট্রন করে। বোকা প্রোমোটাররা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে কণ্ঠে যন্ত্র বাম্বু খায়।

হেভি ঝাড়নের পরে ক্লাব রুম উদ্বোধনের দিনে তাঁকেই সভাপতির আসনে বসান হয়।

*　　　*　　　*

কালী পুজোর পরে বারোয়ারী পুজোর আর ব্যয়ের হিসাব মিলছেনা। লেখা হয়েছে নিরঞ্জন বাবদ এত টাকা ইত্যাদি। জনৈক ক্লাব মেম্বার লাফিয়ে উঠে নিরঞ্জন নামে একজন সদস্যের নামের সামনে ও পেছনে দুটি পুরুষাঙ্গ যোগ করে।

বলল—নিরঞ্জন কি করেছে? ওর জন্য এত টাকা কেন?

হিসাব পাঠক বললে—নিরঞ্জন মানে বিসর্জন—বুঝলি হনুমান।

—তোর কাছে আমাকে বাংলা শিখতে হবে?

—আলবৎ।

—তুই চাঁদা তুলতে গিয়ে ফ্ল্যাটের ঐ ভদ্রলোকের টাইটেল কি লিখেছিলি?

—কি লিখে ছিলুম বল?

—তুই লিখেছিলি মলমূত্র। ভদ্রলোকের নাম মলয় মিত্র ওর অফিস যাবার তাড়া ছিল। তেল মাখতে মাখতে একশ টাকা দিয়ে দৌড়ালেন। পড়ে দেখেন নি তাই বুঝলি।

—আরে যা-বে।

—পৌর সভায় এ্যাসেসমেণ্টের আগে কিছু ছেলে নেয়। তুই দলের লোক বলে তোকে নিয়েছিল। কাজটা কি না বাড়ি বাড়ি গিয়ে কতটা কাভার্ড এরিয়া, কখানা ঘর, মার্বেল মোজেক আছে কিনা তার নোট নিতে হবে। —তুই কি করেছিলি?

—কি করেছিলুম ?

—পাইপ ফেটে ওপর মুখো হয়ে জল ছুটছে, তুই লিখলি ফোয়ারা আছে। ভদ্রলোক ব্যবসাদার। মাল কড়ি ভালই আছে। হিয়ারিং ডেটে গিয়ে তো অবাক। বললেন—মার্বেল মোজেক তো আছেই। কিন্তু ফোয়ারা ?

সেদিন পাইপ ফেটে জল উঠছিল ঝরণার মত। তাকে ফোয়ারা বানিয়ে দিল আপনাদের লোকেরা ?

হিয়ারিং বোর্ডের সদস্যরা মানে কাউন্সিলাররা উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন, তারপর যথারীতি পাঁচ টাকা ছাড় দিয়ে ট্যাক্স ধার্য করলেন।

—আরে বেশি নাক নাড়িস না শালা। ডাক্তার ওর ভাইয়ের জ্বর দেখে প্রেসক্রিপশন করে গেছে। উনি আবার খোদার ওপরে খোদকারী করে ওষুধের দোকানে ক্যালপোল (জ্বর নামার ওষুধ) না বলে ক্যালকাটা পুলিশ বলেছিলি না ?

—ছাড় ছাড়। তারপর সভাভঙ্গ হল প্রবল হাসাহাসির মধ্য দিয়ে। প্রায় সকলে বাড়ি ফিরে গেল। ক্লাব রুমে থাকা দু-চারটি ছেলে রয়ে গেল। ওরা বাড়ি যায় না। গভীর রাতে 'জল' খায়।

তারপর কেউ বমি করে, কেউ খিস্তি করে বেসামাল হয়ে। সেদিন বোধহয় মাত্রাটা একটু কম ছিল। পয়সা হাতে কম থাকায় সত্তর টাকার বোতল কিনেছিল। পাশের বস্তিতে একটি হিন্দুস্তানী যুবক একলাই দরজা খুলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘরে অন্য লোক কেউ ছিল না। ওরা গিয়ে ডাকলো তাকে। উত্তরে সে আরো নাক ডাকাতে সুরু করল।

ওরা চার জনে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে খুব সাবধানে

খাটিয়াটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

তারপর শ্মশানের দিকে দে দৌড়—

রাম নাম সত্য হায়
নিমতলা মে যাতে হয়।

বলা দরকার খাটিয়ার ওপর থেকে হিন্দুস্তানী যুবকটি যে ভাষায় শববাহকদের (মাকে নিয়ে) গালি দিল তা লেখার অযোগ্য।

ওরা বলল—বেশি মাজাকি করলে কেলাব।

অব্যক্ত বেদনা

সন্তু সবে মাতৃহারা হয়েছে। ইদানীং একটু অবাধ্যতাও করে। পড়ে অবশ্য ক্লাশ এইটে। স্কুলে যায় না। সারাদিন ক্রিকেট খেলে অথবা মাচায় আড্ডা মারে। জিজ্ঞাসা করলে বলে —মা গেছে হাফ ফ্রি।

বাবা গেলে ফুল ফ্রি।

ফুল ফ্রি যে কি জিনিস সন্তু তো তা বোঝেনা।

ওর বাবা বেশি ঘাঁটায় না। মায়ের অভাব তো পূরণ করার সাধ্য ওঁর নেই, সারাদিন কাজে থাকে। দিদিই যা ভরসা। সেদিন ১লা জুলাই। বিধান রায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিন। রাইটার্সে হাফ ছুটি হয়ে গেছে। বেলা ২ টায় বেরিয়ে রমেনবাবু বিকাল ৫ টায় বাড়ি ফিরলেন। এর নাম কলকাতার যানবাহন। আসলে যাত্রী বেশি, গাড়ি কম, রাস্তা ঘাট সংকীর্ণ, সমস্যা তো হবেই। বাড়ি ফিরেই ছেলের খোঁজ করেন। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন।

—সন্তু কোথায় রে ?

অমৃতা—জানি না।

—খবর রাখিস না।

—যা রাগ।

—ওর দুঃখ বুঝিস না ?

—দুঃখ আমার নেই ?

—তুই তো বড় হয়েছিস, ওকে তো একটু সামলাবি। যাই দেখি সাইকেলটা বের করি।

বাড়ির কাজের মেয়েটা বলল—সন্তু ছাদে আছে।

—কি করে জানলি ?

—উঠতে দেখেছি।

—বাবা ছাদে উঠে দেখে সন্তু ছাদের কোণে বসে কাঁদছে।

—কি হয়েছে বাবা ? দিদি বকেছে ?

সন্তু নিরুত্তর।

—স্কুলে পড়া পারিস নি বলে স্যার কিছু বলেছে ?

—হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় ফল খারাপ হয়েছে ?

উত্তর নেই।

—ও বুঝেছি তোর মার জন্য মন খারাপ করছে ?

—না ওসব কিছু নয়।

—তবে কাঁদছিস কেন বল ?

—কান কটকট করছে।

—তাই বল, চল ডাক্তার খানায় নিয়ে যাচ্ছি।

—লাভ নেই। ডাক্তার বাবুর স্ট্রোক হয়েছে।

—যা চ্চোলে।

গেঁজুড়ে গপ্পো

কলকাতার এক হাসপাতালে একজন ডাক্তার পদ শূন্য হওয়ায় বিখ্যাত এক দৈনিক পত্রে ডাক্তার নেবার জন্য বিজ্ঞাপন করা হয়। বলা বাহুল্য নির্দিষ্ট সময়ে তিন জনের আবির্ভাব।

মেডিক্যাল বোর্ড যথা সময়ে এক একজন করে ডাকতে লাগলেন।

প্রথম জন।

প্রশ্ন—আপনি ?

উত্তর—কবিরাজ।

প্রশ্ন—হাসপাতালে কবিরাজ লাগে নাকি ?

উত্তর—কবিরাজও তো ডাক্তার।

প্রশ্ন—বিজ্ঞাপনটা ভালো করে পড়েন নি।

উত্তর—ভাবলাম দেখি একবার ট্রাই করে।

—যেতে পারেন।

২য় জন।

প্রশ্ন—আপনি ?

উত্তর—হোমিওপ্যাথ।

প্রশ্ন—তার জন্য তো হোমিওপ্যাথ হাসপাতাল আছে। এখানে কেন ?

—যান।

৩য় জনের প্রবেশ।

প্রশ্ন—আপনি ?

উত্তর—সার্জেন।

প্রশ্ন—বসুন। কোন বিষয়ে আপনার বিশেষ দক্ষতা ?

উত্তর—সাধারণতঃ কাটা ছেড়া করাই অ্যামার কাজ।

প্রশ্ন—অভিজ্ঞতার কোন নিদর্শন আছে।

উত্তর—অবশ্যই।

প্রশ্ন—যেমন।

উত্তর—অভিজ্ঞতাটি যেমন দীর্ঘ তেমনই উৎসাহ ব্যঞ্জক।

প্রশ্ন—সার্টিফিকেট ?

উত্তর—সার্টিফিকেট কে দেবে ? রাস্তার অভিজ্ঞতা।

প্রশ্ন—বলুন !

উত্তর—একবার রেললাইন ক্রশ করতে গিয়ে একটি লোক ট্রেনে কাটা পড়ে।

সঙ্গে আমার সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট কিছু ছিল। প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল বলে আগেই দেহের একাংশ বেঁধে ফেললাম। বডির তলার দিকটা একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল। কোমর থেকে বাদ দিতে হল। কাছে চরছিল একটা দুধেলা গাই। ডিসেকসন করে গাইটার লোয়ার বডিটা নিয়ে আহতের কোমরের কাছে জুড়ে দিলাম।

প্রশ্ন—বাঃ, বাঁচল ?

উত্তর—বাঁচবে না মানে !

প্রশ্ন—লাভ কি হল ?

উত্তর—লাভ ? প্রথমতঃ প্রাণে বাঁচল।

প্রশ্ন—ছিল মানুষ, হোল গো-মানুষ।

উত্তর—তাতেই তো লাভ। আগে শুধুমাত্র চাকরি করতো। এখন হ্যাণ্ড ক্যাণ্ট বলে অফিসে হাজিরা দিলেই ২ হাজার টাকা বেতন পায়। প্লাশ বাড়িতে এসে দুকিলো দুধও দেয়। বাঁট আছে তো। তাছাড়া হাফ গরু বলে ফুল প্যাণ্টও লাগে না।

প্রবল হাস্য ধ্বনির মধ্যে ইনটারভিউ বোর্ড স্থির করেন ওঁকে ওঁদের মেণ্টাল ডিপার্টমেণ্টে ভর্তি করে দেয়া দরকার।

বিলম্বিত আত্মহত্যা

লোকটি আমার একান্ত পরিচিত। নেহাতই গোবেচারা। নিদারুণ অভাবের মধ্যে বেঁচে ছিল। ছেলেমেয়ে সব মিলে এগারোটি। আস্ত একটা ফুটবল টিম। নাম ঘনশ্যাম। কদিন, ধরেই ওর ছেলের মুখে শুনছি—বাবা আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করছে।

বললাম—কেন রে? অভাবের জন্য নাকি তোরা খুব জ্বালাতন করিস।

বলল—না। মানে মায়ের সঙ্গে খিঁচাইন। দিদির বিয়ে হয়নি। আমরা সব বেকার। সব মিলে এই আর কি।

—সাবধানে রাখিস।

* * *

পৌষ মাস। ভোরের আকাশে ঘন কুয়াশা। বেশ কেমন উদাস করা দিন। আকাশের দিকে চেয়ে ব্রাস করছিলুম। সূর্য্য দেবের প্রাতঃ রাশ হিসাবে ধীরে ধীরে কুয়াশার আস্তরণ সরে গেল। দেয়াল ঘড়িটা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। স্কুলের দেরি হয়ে গেল। স্কুল ছুটির পরে ডানকুনি যাবার কথা।

টিকিট কেটে দক্ষিণেশ্বর আপ ষ্টেশনে উঠতে যাচ্ছি। দেখি ঘনশ্যাম ডাউনে উঠছে। ওদিকে গাড়ি ছিল কিনা জানিনা। ষ্টেশন কিন্তু ফাঁকা। ওর হাবভাব দেখে সন্দেহ হল। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় যাবে।

উত্তর—শেয়ালদা।

—কেন?

—দরকার আছে।

ঘনশ্যামের চোখ মুখ দেখে মনে হল ও কিছু একটা করতে চায়। ওর হাতে একটা ছোট্ট কৌটো।

—কি আছে ওতে ?

—চিড়ে ভাজা।

—কেন ?

—ডানকুনি লাইনে ট্রেনের তো ঠিক নেই। পেট তো মানবে না। দেরি হলে টিফিন খাবো।

আত্মহত্যা করবে! কিন্তু গাড়ির দেরি হতে পারে ব'লে সঙ্গে চিঁড়ে ভাজা!

—চা খাও।

—না থাক, তাড়া আছে।

—জোর করে চা খাইয়ে হাতে একটা বিড়ি গুঁজে দিয়ে বললুম—বাড়ি যাও।

—না।

—যাও বলছি। কড়া ভাবে বললাম। বাধ্য ছেলের মত দক্ষিণেশ্বরের দিকে নেমে গেল।

* * *

আমার ট্রেন এসে গেল। চলে গেলাম। এ যাত্রা বোধহয় রক্ষা হল।

পরের দিন সকালে চা খেতে খেতে কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ চমকে উঠলাম একটা খবর দেখে।

খবরটি সংক্ষিপ্ত। দক্ষিণেশ্বর ষ্টেশনে ডাউন শিয়ালদাগামী ট্রেনে জনৈক ঘনশ্যাম দাস আত্মঘাতী হয়েছে।

গাড়ি লেট করছে বলে সময় কাটানর জন্য চিড়ে ভাজা হাতে নিয়ে ঘনশ্যাম অপেক্ষা করছিল। কিন্তু মিস করেনি। কেমন যেন বোকা বনে গেলুম। মিস করলুম আমি।

নিম্ব

ন-পাড়ার কেষ্টদা নেহাতই নিরীহ মানুষ। ওদের বাড়িতে একটা বিরাট নিমগাছ আছে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরে রাত্রে ফিরে দোতলায় ছোট্ট বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেষ্টদা রোজই সিগারেট খান। আর নিম গাছটার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবেন। ওটাই ওর দিনান্তের রিলাকশেসন্। বাবা কাকাদের আমলের নিমগাছ। সারা বছর ছায়া দেয়। ফাল্গুনে কচিপাতার ঢল নামে। পাড়া শুদ্ধ লোক আঁকসি দিয়ে পাতা পেড়ে নিয়ে যায়। কেষ্টদার বাড়িতে আঁকসি নেই। সাবালক ছেলেও নেই। তার উপর ঘাড়ে স্পণ্ডেলাইটিস্। উঁচু ডালে পাতা। কাজেই নিমপাতার ব্যাপারে উনি পরনির্ভরশীল। পাতা নিয়ে যাবার সময় লোকেরা অবশ্য দিয়ে যায় কিছুটা। কিন্তু চাইতে হয়।

নিমের এখন খুব কদর। আমেরিকা নাকি পেটেণ্ট করতে চায়। কেষ্টদার বউ এই কথাটার মানে বোঝে না। জিজ্ঞেস করলে কেষ্টদা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন, ওসব তোমার মাথায় ঢুকবে না। উনি যেন সব বোঝেন, কিন্তু বউকে বোঝানোর দায়িত্ব নিতে চান না। নিমগাছের তলায় জন্মেছিল বলে শ্রীচৈতন্যের ডাকনাম নিমাই। ধুত্তোর যত্তসব গুলগাপ্পা। তাহলে, জামগাছের তলায় জন্মালে তাকে জামাই বলে ডাকতে হবে, কেষ্টদার হাসি পায়। নিমের নাকি ভীষণ ভেষজগুণ। শিবকালী ভট্টাচার্য এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। ন-পাড়ার কেষ্টদাও কিছুটা জানেন তবে বিশেষ ভাবে অজ্ঞ নন। ওর এক কবিরাজ বন্ধু শ্লোক বলেন—

বসন্তে ভ্রমনং কুর্য্যাৎ অথবা নিম্ব পত্র ভোজনম্
অথবা যুবতী ভার্য্যা, অথবা বহ্নি সেবনম্ ।

ওহো নিমগাছ নিয়ে যে চণ্ডীপাঠ হচ্ছে। কিন্তু বাবা শ্লোকের মানেটা কী? মানে? মানে হচ্ছে—বসন্তকালে ভ্রমণ, নিমভোজন এবং যুবতীর সান্নিধ্য—এই তিনের অভাব হলে মৃত্যুই ভালো। বহুত আচ্ছা। বাছাধন, দুটাকা আঁটি নিমপাতা কিনতে হলে তোমার শ্লোক শোকে পরিণত হত। ওদিকে বাজারে দু-চারটে পাথর, আংটি, নিমডাঁটা ও কয়েকরকম শিকড়-বাকড় নিয়ে কবিরাজ উচ্চৈস্বরে হেঁকে চলে—অজীর্ণে, স্বপ্নদোষে, বহুমূত্রে, রক্ত শর্করায়, চোখঝাপসায়, জণ্ডিসে, কৃমি-অরুচিতে নিমের ব্যবহার বিধেয়। নিম অশুভ নাশ করে, শুভের সূচনা করে, তাই রাজস্থানের বিবাহে, বাঙালীর শ্মশান ফেরতা যাত্রীরা নিমপাতা ব্যবহার করে। আরে বাবা অনেক হয়েছে। এবার একটা বিড়ি ছাড়। খদ্দের না থাকায় শালা লোক ধরে ধরে নিমকীর্তন করছ। কে শুনবে ওসব। এত গুণ থাকলে খদ্দেরের লাইন লেগে যেত। দম ফেলতে পারতে না চাঁদু।

কেষ্টদা ডায়াবেটিক রোগী। ঘন ঘন প্রস্রাব করেন। দিনের বেলায় বাথরুমে যান। রাত্রে জোরে চাপলে বাথরুম অব্দি পেঁাছাতে পারেন না। লুঙ্গি ভিজে যায়। দোতলার বারান্দা থেকেই কাজটা সারেন। ভাড়া বাড়ি তো নয়। হাজার হোক নিজের বাড়ি। বলনেওলা তো নিজেই।

কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত। হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ। একদৌড়ে বারান্দায়। গাছের তলায় বিড়ির আগুন। কারা যেন ফিসফিস করছে। প্রস্রাব মাথায় উঠল। সত্তরের দশক হলে নকশালপন্থী যুবকদের কথা মনে হত। ক্ষুদিরামের সন্ত্রাসবাদ। ওসব তো গল্প কথা। জমানা পাল্টে গেছে। এখনতো চোরের দশক।

মাঝে মাঝে ওপরের দিকে তাকাচ্ছে। আর চাপতে না পেরে কেষ্টদা শুরু করে দিলেন।

—ছিঃ, ভদ্রতা জানে না। মাথায় কেউ প্রস্রাব করে!

—চল, এখন! শালা ছোটলোক।

একদৌড়ে গোটাকতক ছেলে পালাল।

কেষ্টদার সে কি হাসি।

ওর স্ত্রী সব জানতে পেরে বললেন—যাকগে। বোধহয় গ্রাম রক্ষী বাহিনীর ছেলেগুলো, নয়তো চোর হবে। বাইরে যাই হোক না কেন ভেতরে তো কেউ ঢুকছে না। শুয়ে পড়। ঐ তো সেদিন পূর্ণিমা রাত্রে নবীন ঘোষের উঠতি বখা ছেলেটা একটা মেয়েকে কাছে পেয়ে কী বলেছিল জান?

—কী?

—আমি তোমাকে পোচুর ভালোবাসি।

—কীর্তি দেখ। অবশ্যি সেদিন ছিল ভ্যালেন্টাইন দিবস।

—সে আবার কী? কেষ্টদা স্ত্রীর প্রশ্ন।

—ওসব তুমি বুঝবে না। সাহেবী কেতা গো।

কথা বলতে বলতে কখন যেন দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েন।

পরের দিন সকালে ব্রাশ করতে করতে কেষ্টদা কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে একবার নিমগাছের দিকে তাকালেন বাইরে এসে।

—একী? সব ভোঁ মারা!

—কী হয়েছে?

—কী আর হবে। নিমপাতা কোথায়?

—গাছটা যে একেবারে ন্যাড়া।

—ছোটলোক। টাকা পয়সা, সোনাদানা নয়, নিমপাতা। তাও এ জমানায় থাকবে না! কী দিনকাল এলো রে বাবা!

যাক। কী আর করা যাবে। গরিবের ঘোড়া মরে। কেষ্টর নিমপাতা চুরি যায়।

বাজারের থলি হাতে কেষ্টদা বাজারে চললেন। মানিকের কাছ থেকে তিনি সবজি কেনন। ভালো ছেলে। দশ টাকার ওপর বাজার করলে এক ভাঁড় চা খাওয়ায়।

—নিমপাতা নিয়ে যান।

—হঠাৎ ?

—এক টাকায় আঁটি।

—আণ্ডার সেল করছিস কেন ?

—সেল না হলে আণ্ডার সেল তো করতেই হয়।

—বাপের ব্যাটা হলে সত্যি কথা বলবি।

—বলছি। আপনার হাঁটুতে বাত, ছেলেরা বাচ্চা, বাড়িতে আঁকসি রাখেন নি, বৌদি মোটা। কাজেই—

—কাজেই তোরা চুরি করবি ?

—চুরি নয়, আমি টেণ্ডার ডেকেছি।

—কার হয়ে ?

—আপনার হয়ে।

—কেন ? কে দায়িত্ব দিয়েছে ?

—দায়িত্ব কেউ দেয় না, ছিনিয়ে নিতে হয়। ভয় নেই ওয়ান পারসেণ্ট আপনাকে দেব।

—কতয় কিনেছিস ?

—আগে চা সিগরেট খান পরে বলছি।

—চোরেদের পয়সায় খাই না।

—কমিশনে খাবেন। দেড়শো টাকার পাতা।

—বিক্রি ?

—চারশো টাকায় বেচেছি।

—শুয়োর।

—গাল দেবেন না। দুদিন পরে পাতা পেকে যেত।

—বাড়ি গিয়ে অফিস কামাই করে আজই গাছ কেটে বিক্রি করে দেব।

— যাচ্ছি চলুন কিনে নেব।

মস্তি / মাজাকি / মহব্বৎ

একটি যুবক। নাম নবীন দাস। নিতান্তই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। এক সময়ে উত্তর ২৪ পরগণার গ্রামের বাড়িতে ছিল বিশাল আম বাগান। নারকেল বাগান। বাবা নেহাতই সরল সাধাসিধে মানুষ। তাঁকে ঠকিয়ে নিয়ে আত্মীয় বন্ধুরা দাড়িয়ে উঠেছে। তিনি অসহায় ভাবে বসে পড়েছেন। সে সব গপ্প কথা। নবীন উঠতি বেপরোয়া যুবক। কিন্তু ভীষণ দিল খোলা, বাবা মাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। দিনের বেলায় পান্তা ভাত, বাদাম ভাজা খেতে ভালবাসে। কখনও বা অভাবে পড়ে খাসদানাও। ইলেকট্রিকের আলোর চল হয় নি ওদের ওখানে তখনো। কেরোসিনের অভাব। তাই স্কুল থেকে ফিরেই পড়তে বসা। তারপর অন্ধকার নামলে রাস্তায় বেরোন। পড়াশুনায় মাথা ছিল। কিন্তু দুষ্টুমীতে সিদ্ধ হস্ত। বেজায় বেপরোয়া। দারুণ একরোখা। ফুটবল খেলায় ওস্তাদ। গান পাগলা। বিশেষ করে কিশোর কুমারের গান। যাত্রা দলে বিপ্লবীর ভূমিকায় অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দিতে পারতো। ইচ্ছা ছিল ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে গানের দল তৈরী করবে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে হিন্দী ফিল্মের গান গেয়েছে মিউজিকের তালে তালে। কিন্তু দারিদ্রের জ্বালায় সঙ্গীতের সখ ঘুচে গেছে।

*　　　*　　　*

চেহারা কপিলদেব মার্কা কালো। ভাসা ভাসা চোখ। নাকটা একটু চাপা। নিটোল গাল! গায়ে ভাল্লুক জাতীয় লোম নয়। ছোট ছোট লোমে ভরা। মাথা ভর্তি চুল। বেশ কেমন সুন্দর চেহারা। চোখের চাহনী আকৃষ্ট করতে পারে সকলকে। ছেলে তো নয় যেন জীবন্ত স্প্রিং।

দস্যিপনা, বদমায়িসি, না গ্রাম্য বাঁদরামী কি বলবো। এক কথায় সঠিক বিশেষণ নেই নবীনের নামের আগে।

রাতের অন্ধকারে শীতকালে গাছে গাছে উঠে খেঁজুর রস চুরি করে খায়। তারপর ভাঁড় ভর্তি পেচ্ছাব করে দিয়ে নেমে পড়ে। সরস্বতী পুজোর আগের দিনের রাতটা তো মওকা। কার গাছের কাঁচকলা কেটে নামাচ্ছে। নারকেল চুরি করতে গিয়ে তাড়া খেয়ে গাছ থেকে পড়ে। বুক চিরে রক্ত ঝরায়। আবার পুজোর কার্ড নিয়ে মেয়ে স্কুলে গিয়ে বড়দিকে কার্ড দিয়ে বলে—ক্লাশে ক্লাশে গিয়ে বলে আসবো ?

বড়দি—কেন ?

নবীন—আপনি তো নানা কাজের মানুষ যদি ভুলে যান।

বড়দি—কোন ক্লাশে পড় ?

নবীন—এইটে।

বড়দি ওর কান পাকড়ে বলেন—এই বয়সেই এত।

কান ধরে চড় মারেন।

নবীনের দশা দেখে সহযোগিরা দাঁত বের করে হাসে।

নবীন—নারে পুলিশের চড় হলে অন্য কথা। মেয়ে মানুষের চড় তো, ভীষণ অপমান লাগছে। যাকগে স্কুলে গিয়ে বলিস না যেন।

ব্যাপারটা গোপন রাখার চেষ্টা করে। পাছে ওপোন হয়ে যায় তাই সহপাঠিদের স্কুলে খাওয়ায়। অন্যের গাছে ঢিল মেরে কুল পাড়ে। গাছের মালিক বৃদ্ধ। টাক মাথা। টাকের ওপর ঢিল পড়লে মুখ খারাপ করে বাপ মা তুলে গাল দেয়। নবীনের খুব মজা লাগে।

বলে—কুলের সঙ্গে হয় নুন নয় খিস্তি। নয়ত জমেনা। খেতে ভাল বাসে। বিশেষ করে পাতলা এবং গরম খিচুড়ি।

বালক ভোজন, কাঙালী ভোজন, যেখানেই চান্স পায় পাতা নিয়ে বসে পড়ে।

এক সময়ে রাত জেগে বাগানের আম পাহারা দিত। ঐ সুযোগে ভূত সেজে লোককে ভয় দেখান ওর নেশা ছিল। শহরের লোকেরা শ্রাদ্ধের পরে যেমন গঙ্গায় পিণ্ড দান করে, ওদের গ্রামে বনজঙ্গলে বেনা গাছের তলায় ভূত পিণ্ডি রেখে আসা হত। সঙ্গে প্রসঙ্গে শ্রাদ্ধের উপাদেয় খাবারও। আর যায় কোথায়। তড়িৎ গতিতে উপস্থিত হয়ে সবকিছুই গিলে খেত। যাদের বাবা মারা গেছে তারা পরদিন সকালে গিয়ে দেখতো পাতা চাট পুট।

—আহা বাবা আমাদের কত ভাল বাসতো দেখ। দিতে না দিতেই খেয়ে গেছে।

বাবার আত্মা তো।

নবীন—সত্যিই আপনাদের বাবা আপনাদের খুবই ভাল বাসতেন। আসলে ছেলে মেয়ের মায়া ভূত হয়েও কাটান যায় না।

একবার ঘাড় অব্দি হিপি চুল রেখে মেয়ে স্কুলের ধারে লুঙ্গি পরে স্কুল গামী মেয়েদের টন্ট করছিল সদলে। হঠাৎ সাদা পোষাকে পুলিশ এসে বেধড়ক ধোলাই দেয়। দৌড়ে পালিয়ে আসে। ও পথে আর নয়।

পুলিশের গুঁতোয় ওদের লজ্জা কিসের। মেয়েমানুষের থাপ্পড়ের মত অপমানজনক তো নয়।

* * *

সাহস? নবীনের সাহস অপরিসীম। পরীক্ষার হলে টুকলী মাষ্টার। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকের পরে সংসারের অভাবের জ্বালায় লেখা পড়ায় ইস্তফা দিতে হয়। সাহসী জীবন সব পারে।

পাড়ার জনৈক ভদ্রলোকের স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। দরজা ভেঙে নবীন তক্তাপোষে উঠে পা তুলে ধরে। কিন্তু শেষ

রক্ষা হয়নি। একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক ২য় বার বিয়ে করেন। ২য় পক্ষের স্ত্রী জলে ডুবে আত্ম হত্যা করে। নবীন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুলের ঝুঁটি ধরে তুলে আনে। সেটাও লষ্ট কেস। ভদ্রলোকের আবার বিয়ের ইচ্ছা। বাড়িতে এক গাদা ছেলে মেয়ে। নবীন স্পষ্ট বলে আসে—এবার হ্যাট্রিক করুন। ৩য় স্ত্রী নিশ্চয় গায়ে আগুন দেবে। ডাকবেন কম্বল চাপা দিয়ে বাঁচিয়ে দেবো। আপনার আলুর দোষ আছে নিশ্চয় নইলে প্রত্যেকটা বউ আত্ম হত্যা করে কেন?

বলা বাহুল্য তৃতীয় বিয়ের তোড়জোড় করতে গিয়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি মারা যান। নবীনের আপসোস—হ্যাট্রিক হলনা বলে।

* * *

নবীন দাস। কিন্তু কাটে ঘোড়ার ঘাস নয়। সব রকমের কাজ জানে। মেসিনে সেলাই করা, গাছে উঠে নারকেল আম পাড়া। ভাল রান্না করা।

কাজের বাড়িতে খাসির মাংস ও বিরিয়ানী করার তদ্বির করা, পরিবেশন করা, ভাঁড়ার সামলানো। সাধে কি লোকে ওকে ভাল বাসে। পাড়ার লোকের উৎসবে, আনন্দে, বিপদে এগিয়ে যাওয়া ওর অভ্যাস। ওর ভালো লাগা। অন্য দিকে রাতের অন্ধকারে ভিজে গামছা চাপিয়ে দিয়ে প্রতিবেশীর মুরগী মেরে গাছ তলায় বসে ফিস্ট করা। সবই পারে। ফাঁকা মাঠে বসে ইয়ার দোস্তদের কোঁছার কাপড়ে রেখে মুড়ি লঙ্কা খাওয়া। কারণ খবরের কাগজ তো সব সময় মেলেনা। পা মেসিন চালিয়ে বাপকে সেলাইএ সাহায্য করতে করতে একবার ওর ঘাড়টা একটু বেঁকে গিয়েছিল ডান দিকে। বাবা ডাক্তার খানায় নিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে বল্লেন—স্পণ্ডেলাইটিস।

প্রেসক্রিপশন করার আগেই নবীনের কেস হিস্ট্রী বর্ণনা।
আচ্ছা ডাক্তার বাবু ঘাড়ে স্পণ্ডেলাইটিস। ঠিক আছে আমার হাতেও বোধহয় হ্যাণ্ডে লাইটিস হয়েছে। হাতটা কনকন করে। একটু দেখুন তো। কিছুতেই ডাক্তার বাবুকে কথা বলতে দেয়না। গড় গড় করে বলে যায়—আচ্ছা আমি যদি একটু কষ্ট করে ডান দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে খেয়াল গাওয়ার চেষ্টা করি তবে ঘাড়টা ডানদিকে না এলেও সোজা হয়ে স্ট্রেট লাইনে আসবে তো ?

ডাঃ—দূর পাগল ?

*　　*　　*

নবীন হোল নাইট আধুনিক গানের জলসা দেখতে ভীষণ আগ্রহী। রেলওয়ে হকারদের মুখে শুনে নিউ বারাকপুরে জলসা দেখতে গেছে সদলে। মাঠ ভোঁ ভাঁ।

আগের দিন জলসা হয়ে গেছে। ফিরে আসে গভীর রাত্রে। বাড়িতে বাবার কাছে থাপ্পড় খায়। কুছ পরোয়া নেই। এবার ওদের নিজের গাঁয়ে জলসা গাইবেন উষা উত্থুপ। আর যায় কোথায়। প্রবল ভীড়ের চাপে গুঁতো গুঁতি করতে করতে একে-বারে সামনের সারিতে এসে উপস্থিত। টিকিট ? মারো গুলি। টিকিট ফিকিট কাটে না। আবার এক ঝটকা হুড়োমুড়িতে পাশের কাঁচা নর্দমায় পড়ে যায়। ফুলপ্যান্টে পাঁক আর গুয়ের গন্ধ। তাই সই। গানতো শুনতেই হবে। ওর দোস্ত অমল বিশ্বাস। গুঁতোর ঠেলায় তার পাছা দিয়ে বেরিয়ে এলো এক দুর্গন্ধ যুক্ত নিশ্বাস। দূর হতভাগা। টিকিট না কেটে ফলসা গাছের মাথায় বসে জনৈক জলসা দর্শনকারী নবীনের মাথায় জ্বলন্ত বিড়ির টুকরো ফেলে দেয়।

—কোন হনুমান রে।

মাথায় ফোস্কা পড়ে যায়।

শেষে জলসা ভাঙলে আহত পা, গুমাখা প্যাণ্ট নিয়ে রিক্সা ভ্যানে চড়ে বাড়ি ফেরে। বিয়ে বাড়িতে বাসর জেগে হিন্দি গানে মাত করে দিতে পারে নবীন। সঙ্গে যদি এক ছিপি মাল জোটে তো কথাই নেই। তবলা হিসাবে মাটির হাঁড়ির উপুড় করা।

*　　　*　　　*

ব্যবসা—অল্প পুঁজি নিয়ে সব রকমের ব্যবসায় পটু নবীন। মুরগীর ব্যবসা। দাঁড়ি পাল্লা নেই। ঠিক আছে। আলু, কুমড়ো চলবে না। টেপ দিয়ে মেপে লাউ, পুঁই শাকের ব্যবসা।

*　　　*　　　*

বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণে পটু নবীন। একবার হেভি চেকিং। উল্টো দিক দিয়ে ঝাঁপিয়ে নেমে পড়ে। দূরে ট্রেন আসছে দেখে মার দৌড়।

দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে ধরে ছিল যে চেকার ওকে তার মুখে থুথু গয়ের ছিটিয়ে পালিয়ে এসেছিল। সে বাঁদরটা দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে।

লোক লজ্জাকে অগ্রাহ্য করে সামনের লুঙ্গি তুলে চিৎকার করে বলে—এই দ্যাখ শুয়োরের বাচ্চা মাস্থলি। বলে ভীড়ের মধ্যে দে দৌড়। বলা বাহুল্য লুঙ্গির তলায় ওর জাঙ্গিয়া ছিল না।

*　　　*　　　*

নবীনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ উঠতি মেয়েদের আকৃষ্ট করে। উঠতি মেয়েরা ওকে সুযোগ পেলেই তাড়া করে। নবীনের এক কথা—দেখবি আর জ্বলবি। নবীন আসলে চমক দেয় কিন্তু দৃষ্টি এড়ায়। একবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে ফিস্ট করতে গিয়ে জাঙ্গিয়া পরে টুইস্ট দিচ্ছিল মিউজিকের তালে তালে। পুলিশ এসে ধরে ফেলে। পুলিশকে ফুলিশ বানিয়ে কেটে

পড়ে। আসলে পুলিশ বাবাজি পা ফাক করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর হাইড্রোশীল আছে। সেই সুযোগে দু পায়ের ফাঁক দিয়ে দে চম্পট। স্টেজে উঠে ডালের মেহেন্দীর কায়দায় ওর নাচ দেখতে পাড়া ভেঙে পড়ে। আর ধুনোচি নাচ? সেতো টিকিট কেটে দেখার মত। পয়সার অভাবে নায়ক, গায়ক কিছুই হতে পারে নি।

সরস্বতী পুজোর দিনটা নবীনের একটা মত্ত এক্সট্রা বোনাসের মত। স্কুল যাবার নামে বেরিয়ে পড়ে। ঐদিন সব মেয়েরাই শাড়ী পরে এডাল্ট সাজে। এই চান্স নবীনরা মিস করবে কেন? পোস্ট অফিস থেকে টাকা তোলা আর সাইকেলের রডে মেয়ে তোলা প্রায় সমান ওদের কাছে। সরস্বতী পুজোতে উদ্বোধন, দোলের দিনে আবাহন। ছেঁড়া ফুল প্যাণ্ট স্টকে নেই। তাই বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দিয়ে মায়ের ছেড়া শায়া পরে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়। পছন্দের মেয়েটির মুখে মাথায় আবির মাখিয়ে দেয়।

আবার দশমীর দিনে বিসর্জন। 'জল' পানের মাত্রা বেশি হয়ে যাওয়ায় অন্য মেয়ের হাত ধরে টান মারায় পুরানো পার্টনারের সঙ্গে বিচ্ছেদ। এইতো ঘটনা। ফিল্মের কাট।

নবীন ট্রফি। মেয়েরা ওকে লটকে নিতে চায়। নবীন পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়। নবীন সহজেই তুলতে পারে। মেয়েতে মেয়েতে প্রতিযোগিতা হয়। নবীন মজা পায়। নবীন লাটাই। মেয়েদের ওড়ায়। কখনও বা ভোকাট্টা।

কোয়েড স্কুল, কোচিং ক্লাস, কলেজ সর্বত্রই ওর ভাগ্যে জুটে যায়। ও কিন্তু খেলায়। খেলে না। মেয়েরা জানে বেশি, বোঝে কম। এই তো মওকা। চান্স পেয়েও স্বেচ্ছায় মিস করে। ওটাই ওর প্রকৃতি। নবীন লক্ষ্মণরেখা টপকায় না কোন দিন। মেয়েরা গরু হলেও নবীন গরু নয়।

বাজাও তালিয়া।

পুলিশ বা মিলিটারী হতে পারতো। সে রকমই মজবুত চেহারা। না হয়েই ভাল হয়েছে। খুন হতে পারতো। খুন করতেও পারতো। ছত্রিশ ইঞ্চি বুকের খাঁচার মধ্যে পঞ্চাশ ইঞ্চি হৃদয় নিয়ে ওসব চাকরি না করাই শ্রেয়।

নবীনের বন্ধু প্রীতি প্রবল। দোস্তদের না সঙ্গে মস্তি করায় ওর জুড়িদার কারও মেলা মুস্কিল। বাড়িতে শোবার জায়গা নেই। পালা করে এক একদিন এক এক ইয়ারের বাড়িতে সে শোয়। বাবার নাক ডাকার অজুহাত দেয়। আসলে রাতের অন্ধকারে নানা ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের চান্স নেয়।

*　　　*　　　*

একদিন এক বন্ধু ডাকে।

—নবীন আজ আমাদের বাড়িতে থাকবি ?

—কেন রে।

—বাবা ফিরবে না, আমি একা তাই।

—কেন ফিরবে না।

—আর বলিস কেন ? মা মারা গেছে। বাবা আমাকে খুব ভাল বাসে। তাই পেড়েতে অন্যের হাত দিয়ে আমার কাছে বেতনের বেশী অংশটা পাঠিয়ে দেয়।

—তারপর ? নবীনের প্রশ্ন।

—তারপর শনি হাফ ও রবি ফুল ডে কোথায় থাকে কে জানে।

নবীন—বাবার বয়স কত ?

—যতই হোক বাবার এখনো তাকত আছে।

—তাই বল ? আসলে 'সার্ভিস' করাতে যায়! ঠিক বলি নি ?

—হাঁ, কাউকে বলবিনা কিন্তু।

—ক্ষেপেছিস। মা গেছে হাফ ফ্রি।

বাবা গেলে ফুল ফ্রি।

—ও কথা বলিস নি। বাবা কিন্তু আমার জন্যই আর বিয়ে করেনি।

—বাবার সঙ্গে খিঁচাইন করিসনা ?

—নারে। আমার মত বাবাও অসহায়।

—ছোড় দে বস, এ রকম হয়েই থাকে।

মাঝে পার্টি করার সখ হয়। রাত জেগে ওয়ালিং করে। প্যারেড গ্রাউণ্ডের সভার জন্য শত শত হাত রুটি বানায়। পরে নবীনের দাদু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় পার্টি মানেই দুর্নীতি। বড় পার্টির বড় দুর্নীতি। সব ছেড়ে দেয়।

নবীন লোকনাথ বাবার জেরক্স কপি। রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে সবার মুক্তি দাতা।

* * *

সাঁতার কাটতে কাটতে বয়সে ছোট একটা কিশোর জলে তলিয়ে যাচ্ছিল। নবীন হয় গাছে, নয় জলে। স্থলে বিশেষ থাকেনা। তখন পুকুরেই ছিল। ঝুঁটি ধরে তুলে দেয়। তুরন্ত তুলে ধরার পরে অন্যরা ওকে ধরে তোলে। জল খায়নি। বেঁচে যায়।

নবীন কিন্তু জলেই থেকে যায়।

বলে—তোরা ফাষ্ট এড কর।

ইয়ার দোস্তরা ডাকে—উঠে আয়।

নবীন—গামছা লণ্ট। একটা কিছু দে। জলের মধ্যেই হাসে, কাশে, বুড়বুড়ি কাটে।

* * *

ক্লাবে রাত্রে কেরাম খেলে, তাস খেলে। ইনডোর, আউটডোরে

সমান পোক্ত। নবীন নতুনত্বের প্রয়াস। লক্ষ্মী সরস্বতী দুজনেই ওদের ওপর বিরূপ। তাই লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষে ওরা কালো সরস্বতী বানায়। হাতে গাঁট কাটার পাল্লায় পড়ে কাটা মানি ব্যাগ, বাহন পেঁচার বদলে ছুঁচো। ঝাঁপিতে ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি। আর সরস্বতী? ঘট ওলটানো কালোমুখ। হাতে বীণার বদলে তীর ধনুক। পায়ের কাছে বই এর বদলে মই। মাথায় লাল ছাতা। পায়ে হাইহিল জুতো। কালী ঠাকুরের ওরা সিরিয়াস ভক্ত। কথা ছিল (জনৈক সদস্যের প্রস্তাব মত) নিম্নাঙ্গে কাটা হাতের বদলে সর্ট প্যান্ট। মহাদেবের পরণে গামছা (কারণ বনদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী বাঘ মারা নিষিদ্ধ)। কিন্তু মা কালী তো ওদের উপাস্য। কারণ বারি দিয়ে ঢাক ঢোল সহযোগে কালী পুজো করে। পুরুত মশাই একমাত্র মন দিয়ে ওদের কালী পুজো করে। পুরুত মশাই ওদের সরস্বতী, লক্ষ্মী পুজো করতে চায় না। ক্লাব রুমে বেঁধে রেখে টিকি কেটে দেবার ভয় দেখালে রাজি হয়। পার্ট পেমেন্ট করে। বাকিটা পরের বছর। আর কালী পুজোর দিনে তেড়ে 'জল' খাইয়ে দেয়। বেসামাল পুরুত মশাইকে রিক্সায় তুলে বাড়ি দিয়ে আসে।

পরের দিনে দক্ষিণা চাইতে এলে নবীন বলে ওঠে—বেশি খিচাইন করবেন না তো। কাল ফুল পেমেন্ট নিয়ে যান নি? নেশায় বেসামাল হয়ে কোথায় ফেলে দিয়েছেন জানেন না। ফুল পেমেন্ট তো কালই নিয়ে গেছেন।

পুরুত—ঠিক আছে, আগামী বছর আর এ পথে নয়।

নবীন—আপনার জামাই তো আমাদের লাইফ মেম্বার ওকে দিয়েই করাবো।

পুরুত—ওতো ব্রাহ্মণ নয়।

নবীন—আমরা ওকে পৈতে করিয়ে ব্রাহ্মণ সাজিয়ে নেবো। বেশি মাজাকি করবেন না।

ক্লাবে অল বেঙ্গল ইঁতু পুজো, সার্বজনীন ঘেঁটু পুজো, গণ সত্যনারায়ণ সবই হয়। হয়নি শুধু গণ আইবুড়ো ভাত। কারণ সকলের পার্টনার জোটেনি তখনো।

বন্ধুদের বিয়েতে তুলসী পাতা ও দুর্বোঘাস দিয়ে খাট সাজিয়ে কন্যা পক্ষকে তাক লাগিয়ে দেয়।

রজনী গন্ধা ও গোলাপতো কমন।

নতুন কিছু করাতে নবীনের জুড়ি মেলা ভার। ওদের ক্লাবের সদস্যদের একটি ছেলে সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেনা। বেশ একটু স্বার্থপর। অন্যের পয়সায় 'জল' খায়। নিজের দেবার দিনে অ্যাবসেণ্ট হয়। ছেলেটি আসলে রাবড়ি খচ্চর।

রাবড়ি করার পদ্ধতি জানেন তো?

তলায় জ্বাল দিতে হয়। ওপরে বাতাস করে সর ফেলতে হয়। অর্থাৎ একই সঙ্গে গরম ও ঠাণ্ডা করা। একই সঙ্গে কাউকে খেপায়, অন্যকে তোল্লা দেয়। ক্যাডারে ক্যাডারে খুনো-খুনি, আর লিডারে লিডারে চুমু খাওয়ার মত। নবীনকে সাঙাৎরা বস বলে।

—ঠিক আছে বস?

—হারগিস।

একবার ওর মা ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, বাবার ধারণা বিয়ে হলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

নবীন—বিয়ে? বেকার ছেলের আবার বিয়ে কি? ম্যারেজ করে গ্যারেজে ঢুকতে রাজি নই আমি। ভারি মজা না? সাইকেলের চাকায় হাওয়া না দিয়ে হাণ্ডেলে পাম্প করা? ওসব কথা এখন ভুলে যাও।

এহেন নবীনরা একদিন একটা শুকনো গাছের তলায় ধূম-পানে রত হয়ে জাঁকিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। সাইকেল ভ্যানে চড়া একটি বৃদ্ধকে দ্রুতগামী একটি লরি ধাক্কা মেরে জোরে পালিয়ে যায়। ওরা লরি চালককে ধরতে পারেনি। যাকগে। লোকটাকে তো বাঁচান দরকার। নবীন চিৎকার করে ওঠে—চল তাড়াতাড়ি কাছের হেলথ সেণ্টারে যাই। রিক্সা ডাকে। রক্তাক্ত বৃদ্ধের হাত ধরে বলে—ডরোমাৎ!

—জান আছে, প্রাণ আছে বাঁচাতেই হবে। শুকনো গাছটার একেবারে মগ ডালে একগুচ্ছ কচি পাতা দেখে ওরা উৎসাহে ফেটে পড়ে। চট জলদি দৌড়ায় সবাই।

*　　　*　　　*

বয়সের ধর্ম অনুযায়ী নবীন একটু বেশি চঞ্চল। যৌবন ধর্মে টগবগ করছে। একদিন রাত্রে বাড়ির পাশে অন্ধকারে কে যেন কাঁদছিল। নবীন দৌড়ে আসে।

—কে?

—আমি।

—আমি কে?

—রতনের বৌ

—কি হয়েছে?

—মাতাল হয়ে আমাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—চল বাড়ি দিয়ে আসি।

—না। গেলে আবার মারবে। তোমাদের বাড়িতে আজকের রাতটা একটু থাকতে দাও না দয়া করে, কাল সকালে বাড়ি যাব।

অমাবস্যার রাত। বাঁশ বনের গভীর অন্ধকার। নবীন কালো, রাত কালো, যুবতীটি কালো। নবীনের বাড়ি ফাঁকা। বাবা আত্মীয় বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে দুদিনের জন্য চলে গেছে। এই তো মওকা? না এতটা বাড়াবাড়ি বোধহয় ভালো নয়।

সব জিনিসের একটা সীমা রেখা আছে। বাবাকে লোকে শ্রদ্ধা করে। মাকে ভাল বাসে পাড়ার লোক। কালো নবীনের মনে হঠাৎ আলোর উদয় হয়। বুকটা ধড়াস করে উঠে।

—চল বাড়ি দিয়ে আসি।

—না।

—আরে ভয়ের কিছু নেই।

—তোমার বাড়িতে যাব।

—না। তোমার কত্তা আমাকে ভয় করে।

নবীন যথারীতি ওকে নিয়ে বাড়ি পেঁাছে দেয়।

মাতাল রতন দরজায় লাথির আওয়াজ শুনে বলে—কে?

—আমি, তোমার যম। দরজা খোল।

দরজা খুলে গেল নবীনের কণ্ঠস্বর শুনে।

—এই নাও তোমার বউ। ফের যদি মার পিট করো তবে বেদম ক্যালাবো কিন্তু। ঠিক আছে। যাও। ঝাড়ের বাঁশ গাঁড়ে পুরতে যদি না চাও তো সামলে থেকো।

নবীন দরদর করে ঘামতে ঘামতে বাড়ি ফিরে এসে ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছে নেয়। তারপর প্রেমসে একটা সিগারেট ধরিয়ে কিশোর কুমারের একটি গান ধরে। মস্তি ভালো, গাজাকিত ভালো। কিন্তু মহাব্বৎ?

একটু সমঝে। এক সময়ের রোমিও সুযোগ পেয়েও খেল না এক ফোঁটাও হোমিও। ওরতো কোন অসুখ নেই। যা আছে তা যৌবনের জেশ্চার। এটা তো দোষের নয়।

ব্যাণ্ডেল চার্চে বেড়াতে গিয়ে নবীনের এক দোস্ত হঠাৎ হাপিস। কি ব্যাপার? হঠাৎ খাবার সময়ে দেখা।

নবীন—কি ব্যাপাররে?

বন্ধু—কেন।

নবীন—তোর ল্যাং জারি তো আসেনি। তাহলে?

বন্ধু—এমনি, ফাঁকা জংলী জায়গা দেখতে ভাল লাগে।

নবীন—চার্ট না দেখে জঙ্গলে ঘুর ঘুর কোরছ। গাণ্ডু, হ্যানডেল করার জন্য ব্যাণ্ডেলে আসতে হয় নাকি ?

বন্ধু—নারে দোস্ত।

নবীন—বাজে ফুটানি মারিসনা, যা খেতে বোস। দেখবি আর জ্বলবি, সমঝা।

একবার ডানলপের সুপার মার্কেটে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কেনা কাটা করার সময়ে পকেট থেকে টাকা মেটাতে গিয়ে অসতর্কতার জন্য এক গোছা নোট খোয়া যায়। নবীন দেখতে পায়। মোটা বাণ্ডিল। কত আছে কে জানে। অন্য কেউ দেখেনি।

নবীন আড় চোখে দেখে কুড়িয়ে নেয়। কি যেন ভাবে। তারপর ভদ্রলোককে ডেকে টাকাটা ফেরত দেয়। উনি তো অবাক। নবীনকে হাণ্ডসেক করে পুরস্কার দিতে চান।

নবীন তার নিটোল গালটি বাড়িয়ে দিয়ে বলে—কিস মি।

ভদ্রলোক ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। কোন কিসই নবীন মিস করতে চায় না। কিন্তু ঐ টুকুই। টাকার প্রয়োজন আছে লোভ নেই। মেয়েমানুষেরও দরকার আছে। কিন্তু ধীরে চলার নীতিতে ও বিশ্বাসী। তাছাড়া ফ্যামিলি প্রেস্টিজ। বাবা মা। কাউকে ব্যথা দিয়ে নিজে আনন্দ পেতে চায় না।

হুকিং করার চান্স পায়। কিন্তু করে না। ওর দুরন্ত যৌবনের বাঁধ ভাঙে অথচ বন্যা হয় না।

হিন্দুস্তানী বন্ধুদের খুশীর জন্য যাবার জন্য বাস স্টপেজে নেমে ইটাগড় বলে। কারণ টিটা শব্দে ওদের আপত্তি। লক্ষ্মণ রেখা বোঝে। নবীনের সাফ জবাব—যেখানে বসবো, সেখানে

চষবোনা। আনন্দ আধ ঘণ্টার, যন্ত্রণা সারা জীবনের। বিয়ের বয়স হয়েছে। কিন্তু অসুবিধা অনেক, আয় কম, মাথায় ওপর ছাদ নেই। অতএব ধীরে চল বস। হঠাৎ কিছুতে রস আছে কম বেশি। নবীনরা রামকৃষ্ণ নয়, রাম চ্যাটার্জী নয়। দুঃখ হলে কিঞ্চিৎ 'পান' করে। এমন বন্ধু আর কে আছে।

এই তো জীবন ইত্যাদি গান গায়। ভুলে যায় আই বুড়ো থাকার যন্ত্রণা। জীবন্ত, প্রাণ খোলা, কেউ কেউ অস্থানে কুস্থানে যাবার লোভ দেখায়। ওর ঘোর আপত্তি। বলে—তোরা যা। মুঝে ছোড় দে।

সেলাই দিদি

কথাটা শুনে সেবা থমকে দাঁড়ায়, ছাত্রীরা তাহলে ঐ নামে তাকে তামাসা করে। —ইস্‌ কি মর্মান্তিক পরিহাস। ফেলে আসা সেই পাঁচ বছর পরে গোটা দুনিয়াটাই তার কাছে সেলাই করা বিবর্ণ ছেঁড়া কাঁথার মত মনে হয়। সেবা কেবল বিস্মৃত অতীতের স্বপ্ন মধুর স্মৃতিতে তালি মেরে চলেছে। স্কুলের ছুটির পর বাসায় ফিরছিল সে। সারাদিন স্কুলে সীবনের কাজ—বিশ্রী নিরস একঘেয়ে। শনিবার ছুটির পর মেয়ের দল কলরব করতে করতে ফিরছিল। অপেক্ষাকৃত উঁচু ক্লাসের ছাত্রীরা পেছন পেছন কি যেন বলাবলি করে সহাস্য ধ্বনিতে সেবাকে পিছনে ফেলে হনহনিয়ে এগিয়ে যায়। পিছিয়ে পড়েছিল কেবল মণিকর্ণিকা গার্লস্‌ স্কুলের একজন মিস্ট্রেস্‌—সেবা সেন। শনিবারের সবুজ বিকেল তাই কোন নতুনত্ব নিয়ে ধরা দিত না তার কাছে। ধীর পায়ে বাসায় ফিরে সারাদিন ধরে নেতিয়ে পড়া টবের সাজি ফুলের গাছে আঁজলা ভরে জল ছিটিয়ে দেয়। শুকনো রজনী গন্ধার স্টিকগুলো ফেলে দেয়। সুইচ টিপে দিতে ঘরের অন্ধকার হাল্কা হয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে পড়ে। স্টোভে চা চড়িয়ে মুখ হাত ধুয়ে আসে।

* * *

সে আজ সাত বছরের কথা। সেদিনও শনিবার ছিল। ঘাসের ওপর দিয়ে ঠিক এমনি গোধূলি সন্ধ্যার প্রসন্ন বাতাস হাওয়ায় চিরুণী চালিয়ে যাচ্ছিল।

—'প্রতি শনিবার এভাবে মাটি কোরো না।' পলাশ বিরক্তি বোধ করে।

—'কি আর এমন দেরী করেছি।' সেবা উত্তর দেয়, 'এক বান্ধবী পরীক্ষায় বসবে তাকে কিছুটা সাহায্য করছিলাম।'

—'বিনা পারিশ্রমিকে ?'

—'হাঁ'।

—'এনগেজমেণ্ট ফেল করে এ বেগারের সার্থকতা ?'

—'তুমি বুঝবে না তার অর্থ, এখন দেরী করা চলবে না বেশী।' আঁচল পাকাতে পাকাতে সেবা উত্তর দেয়।

—'তবে আসো কেন।' পলাশ ঝাঁঝিয়ে উত্তর দেয়।

—'আচ্ছা যাচ্ছি।'

বাড়ী যাওয়া ওদের সেদিন হয়ে ওঠেনি অত তাড়াতাড়ি। 'কমলালয়ে' গিয়েছিল মার্কেটিং করতে, সেখান থেকে সিনেমায়, তারপর রেস্টুরেণ্টে। স্যাম্পু করা আলুলায়িত কুন্তল, ম্যানিকিয়োর করা নখ, লিপষ্টিক রঞ্জিত অধরওষ্ঠ, সুর্মা শোভিত অক্ষি, হাল্কা ভায়োলেট রঙের মাহেশোর সিল্ক, চর্মবটিকা আর গ্রীসিয়ান চটির চটুল ছন্দ—সব মিলে দর্শনের ছাত্রী সেবা সেনকে বড় বেখাপ্পা লাগে।

—'আজ থেকে তোমার নাম এণাক্ষী সেন, আর আমার নাম ঠিক আছে তাই না ?'

—'হাঁ তাই।'

সেদিন ওরা পাশাপাশি বসেছিল বর্ষার সবুজ জলে নুয়ে পড়া বাঁশ ঝাড়ের মত। পলাশ কিন্তু সেবাকে না বুঝেই তাড়াতাড়ি করছিল।

—'ফ্রী সিলেকশানে মানুষ মাত্রেই অধিকার আছে।'

—'তবে তার অর্থ পারভারশান নয়।'

—পলাশ বিরক্তভাবে প্রশ্ন করে—'পারভারশানের কি দেখলে তুমি ?'

—'এই যে 'বত্রিশ সি বাসে'র মত প্রয়োজনে উধাও হও

আর অপ্রয়োজনে ঘন ঘন দেখা দাও।' সেবার মুখে বাঁকা হাসি।

—'এসব এপিক সিমিলির আমদানী করছ কেন ?'

—'তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও পুরুষের ভগ্নী বা বন্ধু হিসাবে সংসারে আমাদের কি কোন ভূমিকা নেই ?'

—'আছে, সহযোদ্ধা হিসাবে আর এই শোভনসুন্দর সংসার পাতার জন্যই তো মানুষের সংগ্রাম।'

—'এ আমার প্রশ্নের উত্তর হোল না, তোমার কথাই যদি সত্য হয় তবে এখানে নিজেকে এত প্রাধান্য দিয়ে আর পাঁচজনকে খাটো করা কেন ?'

—'নিজেকে বাদ দিয়ে কিছু করা যায় না বলে।'

—'আত্মপক্ষ সমর্থন করা একটা জিদ হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ করে যদি একটু বাচন ভঙ্গি থাকে, এতে নিজেকে যে কত খেলো করা হয় তা বোঝ না কেন পলাশ ?'

—'বিজ্ঞান কি বলে জানো সেবা ?' নিরুপায় পলাশ ভাঙা হাটে আসর জমাতে চেষ্টা করে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সেবা বলে ওঠে—'বিজ্ঞান যাই বলুক আইন বলে······'

—'আইনের ছাত্র আমি'—পলাশ প্রতিবাদ করে।

'অতএব রাত্রি দশটার পর পার্কে আড্ডা দিয়ে বেআইনি কাজ করা ঠিক হবে না, চল উঠি আজ।'

—'আজই কথাটা পাকা করতে চাই।'

—'না আজ নয়।'

—'তবে প্রতারণা করলে আমার সঙ্গে, এত শাড়ী......'

—গাড়ী আর বাড়ীর লোভ এইতো, এমন কি বেশী থাকলেই কিছুটা উপচে যায়, পাশে পাত্র থাকলে তাতে গড়িয়েও পড়ে।

আজ যাও, সুস্থ হলে দেখা কোরো!' রাগে উত্তেজনায় পলাশ ফেটে পড়ে।

—'আমি কি অসুস্থ?'

—'নিশ্চয়. সুস্থ আর স্বাভাবিক হলে তোমার এই ছাপান কার্ডে আমি কালি ঢেলে দিতাম না।

—'একটা উদ্দেশ্য তাহলে তোমারও ছিল?'

—'উদ্দেশ্য বিহীন জগতে কি এমন আছে? পলাশ সেবা সেনের ধোঁকা বাজিতে আর ভুলবেনা।' জানিয়ে নাটকীয় ভাবে যবনিকা টানার পূর্বে ম্লান হাঁসি হেসে সেবা সেন বিদায় নিল। পলাশের সাদা সার্ট, লিলেনের প্যাণ্ট, চেরা সিঁথি আর জ্বলন্ত চুরোট সব মিলে তার দুর্বলতাকে অনুপম মাধুর্য্যে ঢেকে দেয়নি সেদিন।

* * *

তারপর সাত বছরের ছাড়াছাড়ি। সেবার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জীবনটা যেন চারমিনার সিগারেট, সান্তনা আছে, নেই কেবল আভিজাত্য। ব্যাঙ্গালোর ভয়েল পরা এনাক্ষী সেন মারা গেছে। বেঁচে আছে দর্শনের ছাত্রী সেবা সেন, সাদা শাড়ী, আর শান্তিনিকেতনী ব্যাগের মধ্যে খোলস ছাড়া সাপের মত নির্বিকার চিত্তে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুব সুন্দর বা কুৎসিত মনে হচ্ছিল না, কিন্তু এখনো কেমন যেন মোহময়। মুখে চোখে অভিজ্ঞ শিক্ষিকার স্থৈর্য্য নয়, কলেজ ছাত্রীর চাপা চাপল্যকে একটু লক্ষ্য করলেই উঁকি মারতে দেখা যায়। চা-এর ফুটন্ত জলের আওয়াজ ওর তন্দ্রা ভেঙ্গে দিল। বিদ্যালয়ে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনাও নেই। কারণ দর্শনের ফেল করা ছাত্রী বলে সেখানে আলাদা কোন সুবিধা থাকতে পারে না। পড়ান ছাড়া ওকে মেয়েদের সেলাই শেখাতেও হয়। আজকাল মেয়েদের সঙ্গে বড় রুক্ষ্ম ব্যবহার করে বলে জীবিকার ভিত্তিতে ছাত্রী

সর্দার ওর উপনাম দিয়েছে সেলাই দিদি, অবশ্য সামনা সামনি ওকে অপদস্থ করার বদ উদ্দেশ্য ছাত্রীদের নেই।

তিন চার বছর হল সেবা স্কুল মিস্ট্রেস্। এর মধ্যে তার বহু পরিবর্তনও হয়েছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা উঠেছে, শরীর কিছুটা কৃশ দেখাচ্ছে। ছুটির পর অন্যান্য মিস্ট্রেস্রা সেদিন বাড়ী চলে গিয়েছিল। সেবা বসে সেলাই কলে বোধ হয় একটা রুমাল সেলাই করে নিচ্ছিল। অপেক্ষাকৃত দূরে কাঠের দেওয়াল দেওয়া পার্টিশানের তলায় হেড মিস্ট্রেস্ গভীর অভিনিবেশ সহকারে কি যেন অধ্যয়ন করছিলেন। এমন সময় এক অপরিচিত ভদ্রলোক সঙ্গে এক পাঁচ সাত বছরের বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন।

—'আসতে পারি?'

—সেবা মাথা তুলেই অস্ফুট স্বরে বলতে যাচ্ছিল 'পলাশ!' কিন্তু নিজের ঠোঁটকে ইচ্ছার বিরুদ্ধ কামড়ে ধরে মাথা নীচু করল।

—'নমস্কার।' স্মিত হাস্যে পলাশের স্বচ্ছ সম্বোধন। কোথাও একটু জড়তা বা সঙ্কোচ নেই।

—'এই মেয়েটিকে আপনাদের স্কুলে ভর্তি করাতে চাই।'

সেবা সেলাই কল থেকে মুখ না তুলেই হেড মিস্ট্রেসের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দিল। পলাশ কিছুমাত্র আহত বলে মনে হল না। হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে কি সব যেন কথা বলে চলে গেল। যাবার আগে একটা অনুমতি পর্য্যন্ত চাইল না সেবার থেকে। উঃ কি নির্ম্ম! পলাশ তাহলে বিবাহিত, ঐ তার কন্যা।

সেবাকে উপহাস করা হল। সেবা নীরবে সেলাই কলে মাথা গুঁজে বসে ছিল। কে জানে এ তার অভিমান অথবা অনুরাগ।

—'কোয়ার্টারে যাবেন না?'

হেড মিস্ট্রেসের আহ্বানে সেবা ধড়ফড়িয়ে উঠে পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে নিল।

—'শরীরটা খারাপ নাকি ?'

—'না-তো !'

—'চোখ ঠিকরে বেরোচ্ছে, গলার শির উঠে যাচ্ছে, কারণ কি, অতিরিক্ত পরিশ্রম ?'

—'না, এমনি।'

—'লাইন কেমন লাগছে ?'

—'টিডিয়াস'

—'বেটার চান্স পেলে তাহলে চলে যাচ্ছেন ?'

—ঠিক বলতে পারছিনা কারণ ভ্যাসিলেট করা ছেলেদের স্বভাব, ষ্টিক করে থাকতে পারে একমাত্র মেয়েরাই।

—এত পুরুষ বিদ্বেষী কেন ?

—বিদ্বেষ নয় এটা খাঁটি কথা।

—যাক সব বিতর্ক।

—ভদ্রলোক মেয়ে ভর্তি করালেন ?

—না, সিট কোথায় ?

—মেয়েটি ওঁর কে ?

—কন্যা বোধ হয় !

—চেনা নাকি ?

—না-না।

কামরায় এসে সেবা সেই যে দরজা বন্ধ করল সারাটা সন্ধ্যা আর বেরোলনা। জ্বর হয়েছে ভেবে অন্যান্য সহকর্মীরা জানালা দিয়ে সহানুভূতি জানিয়ে পাশ কাটালেন।......এত অহংকার, বিয়ে করা হয়েছে, কিসের গর্ব, বিদ্যার যশ, কিন্তু তাতে সেবাকে তো ছোট করা যাবে না, তাহলে অর্থের গরম। হয়ত তাই। বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে সেবাকে অপমান ! আচ্ছা-এর প্রতিশোধ নিতে

জানে সেবা সেন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পড়ে দোর খুলে দাঁড়ায় সে। ভাবখানা যে 'য়ুরেকা য়ুরেকা' কি যেন আবিষ্কার করে ফেলেছে সেবা। অন্যান্য মিস্ট্রেসরা ছুটে এসে গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখে ঠিক জ্বরও নেই। তাহলে শুধু শুধু তড়কা হচ্ছে নাকি। সেবা সকলকে ডেকে বলে একটা মজার খবর আছে।

—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমি বিয়ে করতে চাই।' একেবারে নির্লজ্জ, অকপট উক্তি। সমবেত মিস্ট্রেসরা সহাস্যভাবে বলে ওঠে—'এ আমরা আগেই কিছুটা অনুভব করেছিলাম।'

—কি ভাবে।

—খান দান না, গোঁজ হয়ে বসে থাকেন, বাড়ীর খবর জিজ্ঞেস করলে চেপে যান। খুব নর্ম্যাল মনে হচ্ছিল না আপনাকে, তাছাড়া গড়িয়ে যাওয়া বয়েসে……

—যাক সে কথা।

—কথা আর যাবে কেন, কিন্তু এত চেনা লোক থাকতে কাগজের সাহায্য নিচ্ছেন কেন ?

—'মানে আমি একেবারে বৈদিক কায়দায় একটি শান্ত শিষ্ট ভাল মানুষকে…'

—'ঠিক আছে ঠিক আছে আমাদের এক পাত হলেই হল। কি বলেন।'

সকলে মিলে বিজ্ঞাপনের বয়ান তৈয়ারী করে যুগান্তর অফিসে পোষ্ট করে দিল। বেশী ভালো মন্দ যাচাই করা সেবার শোভা পায় না, ওতে খুঁতখুঁতে ভাবটাই বাড়ে। জীবনে বড় হবে এমন কত কি সাধ ছিল তার, অথচ পলাশকে আঘাত দেবার জন্য আজ সমস্ত বাসনাকে কুঁকড়ে মারতে হবে…একেই বলে প্রতিহিংসা। বিজ্ঞাপন কাজ দিল। উৎসাহী মিস্ট্রেসরা ছুটির দিনে ছেলে দেখে এসে সেবাকে রিপোর্টিং করতে গেলে বিরক্তিভরে সেবা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

—'আমি ওসব শুনতে চাই না, আপনাদের ওপর সব দায় দায়িত্ব, বলেছি না এটা একটা এক্সপেরিমেণ্ট… ..

—'বেশ বেশ তাহলে আমরাই সব করছি খারাপ হলে জানি না'।

—'হোক খারাপ।'

* * *

ফাল্গুন পূর্ণিমার রাত। আকাশে দুধের ফেনার মত জ্যোৎস্না লুটোপাটি খাচ্ছিল। মিস্ট্রেস কোয়ার্টারের মধ্য থেকে নহবতের মধুর রাগিণী সেবার কানে কতদূর প্রবেশ করছিল জানি না। পরণে রক্ত চেলি আর চোখে লাল প্রতিহিংসার আগুন। সেবার বিয়ে হয়ে গেছে শুনলে বিবাহিত হলেও পলাশের কষ্ট হবে। সেবাকে চন্দন পরাতে পরাতে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন জনৈক শিক্ষয়িত্রী অতিথি বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে পরিচয় দিচ্ছিলেন যে জামাই বোনের বাড়ী থাকে। বোন ছা পোষা। ইত্যাদি।

বিয়ের পূর্বেই সেবাকে কেমন মন মরা দেখাচ্ছিল। শুভ দৃষ্টির সময় সে সকলের শংখ ও উলুধ্বনিকে ম্লান করে চীৎকার করে উঠল—'এঁ্যা তুমি ?' একবার হাঁকপাক করে যেন জলমগ্ন শিশু আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বর ভদ্রলোকের মুখের চেহারাটা সিল্কের উড়ুনীর তলাকার আলো আঁধারিতে ঠিক বোঝা গেল না।

কি হোল কি হোল বলে সমবেত বরযাত্রী আর কন্যাপক্ষের দল একবার ছুটে গেল। বাসর ঘরে একটু আধটু জলের ছাট পড়লো, পাখার বাতাস চললো। তারপর সব ম্যানেজড…।

বিয়েও যথারীতি বৈদিক কায়দায় অনুষ্ঠিত হল। কাজের একটা ফাঁকে মহামান্যা ঘটক ঠাকুরাণীরা সেবাকে একবার কানে কানে প্রশ্ন করল—'বর পছন্দ হয়নি নাকি ?' সেবা নিরুত্তর।

—'তাহলে ওটা না খেয়ে থাকার জন্য।'

* • *

রাত্রে বাসর জাগানিয়ারা শূন্য গুড়ের কলসীর মত অচেতন বা আধা চেতন অবস্থায় মগ্ন দেখে বর বধূকে নম্রভাবে প্রশ্ন করে—'লবের ক্ষেত্রে আপনার তাহলে নিজস্ব কোন Stand নেই ?'

সেবা পূর্বের মতই নির্ব্বাক।

—'অবশ্য দালালি ধরে এই প্রৌঢ় বয়সে...ঠিক ইচ্ছে ছিল না কিন্তু জিদ করে সিনিক হয়ে সারা জীবন কাটানতেই বা লাভ কি এমন !'

সেলাই দিদির মুখ আজ সত্যই কে যেন সেলাই করে দিয়েছে তাকে সবাক করার জন্য সমস্ত মণিকর্নিকা স্কুল কথা কয়ে না উঠলেও হয়ত কোন গোপন অশ্রু ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিল স্কুল বাড়ীর নির্জ্জন প্রান্তরে। কে জানে সেবার মৌনতা নিরুপায় বশ্যতা স্বীকার অথবা উদার আত্মত্যাগী ভোর রাতে নহবতের শেষ রাগটা একবার ককিয়ে উঠে শান্ত হয়ে গেল। কোথাও বোধকরি একটা ছন্দ পতন ঘটে গেছে।

বাংলা (বাংলু) বন্ধ

অনেকে বলেন মিডিয়ার প্রচারের কল্যাণে নাকি বর্তমানে ধূমপান কমেছে। জানিনা। তবে মদ্য পান যে বেড়েছে তাতে কিছু মাত্র সংশয় নেই। কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এবং বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে একটু আড়ালে মদ খাওয়ার প্রচলন পশ্চিম বঙ্গের পানীয় ঐতিহ্য। ছিল এবং আছে। বর্তমানে স্কুলে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে ঠাকুর সাজানর অজুহাতে ছাত্ররা রাত জাগে। বেশ কিছু স্কুলে ঐ উপলক্ষে মদ চলে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার মদের ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছেন। উদ্দেশ্য কর সংগ্রহ। ফলে গোপন ব্যাপার এখন ওপোন হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত সঙ্গীত মনে পড়ে।

"আরো আরো প্রভু আরো এমনি করে মার"

সরকারের অর্থের দরকার। আপনি আমি কে ? ভারতবর্ষে কেন সারা বিশ্বেই মদের প্রচলন চিরন্তন। বিশেষ করে শীত প্রধান দেশে। আদিম জনগোষ্ঠী বা ব্রাত্যজন ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এই পান দোষ ছিল। অভিজাতরা রাম, ভোদকা, ব্রান্ডি, শেরি ইত্যাদি খেতেন বিলাসিতার জন্য। গরীবের জন্য মহুয়া, তাড়ি, হাঁড়িয়া। বর্তমানে মধ্যবিত্তদের মধ্যে সরকারী আনুকুল্যে মদের ঢালাও প্রচলন হয়েছে। ১৯৯৮ সালে মাদ্রাজে দেখেছি ফুটপাত জুড়ে মোটর বাইক পাশে রেখে ঝাঁকে ঝাঁকে তরুণ ও যুবকরা প্রকাশ্য ফুটপাতে মদ্য পান করছে।

দেখা যাক রামায়ণ মহাভারতের যুগে কি ছিল। আর্যরা যজ্ঞের আহুতি দিতেন কচি গোবৎস দিয়ে। সুরা সহযোগে

তার খানাপিনা চলত। মদের চাট গোমাংস। মহেঞ্জদারো সভ্যতার খনন কার্য্য থেকে পাওয়া গেছে সুরা হাতে নৃত্য রত নারী-মূর্তি। দেবতাদের ব্যাপারটাই আলাদা। ঠিক আছে। দেবাদি-দেব মহাদেব আফিং, সিদ্ধি, সুরা, গাঁজা কি না সেবন করতেন। সম্ভবতঃ সুরা পানের মাত্রাধিক কারণে যদু বংশ ধ্বংস হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের তো লণ্ড্রীর ব্যবসা ছিলনা। তবে কি করে স্নানরতা গোপিনীদের শাড়ীগুলো নিয়ে দিব্যি কদম আছে উঠে পড়লেন! লীলা? আসলে হার্ড ড্রিংস কিছু গিলেছিলেন। মদ্যপ দুঃশাসন প্রকাশ্য সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করেন। পাণ্ডবরাও নিশ্চয় 'যোতিশে' পান করে ছিলেন! তা না হলে চুপ করে বসে থাকলেন কেন। পাশা খেলায় হেরে গেলে গৃহবধুকে বিবস্ত্র করতে হবে তাও আবার পাবলিকলি। ছ্যাঃ। কবি কালিদাস তো মদ্যপ অবস্থায় পতিতালয়ে মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

চলে আসুন মোগল যুগে—একমাত্র আওরঙ্গজেব ছাড়া প্রায় সকলেরই পানদোষ ছিল। বাবর তো মদ্যপ অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে মশাল জেবলে রাত্রে উন্মত্ত অবস্থায় দৌড়াতেন।

কবি ওমর খৈয়ামের কাব্যগ্রন্থ তো সুরা আর সাকির জন্য বিখ্যাত। দেখা যাক ভারতে ইংরাজ আমলের ব্যাপার স্যাপার। লর্ড কর্ণওয়ালিশ এদেশে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ফলে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব।

তাদের উপজীব্য মদ ও বাইজী নাচ। দুর্গা পুজা উপলক্ষে, বড়দিন উপলক্ষে সাহেব সুবোদের নিমন্ত্রণ করার রেওয়াজ ছিল জমিদারদের মধ্যে। মদের ফোয়ারা উড়তো। সাহেবদের তোয়াজ করা আর কি?

আধুনিক যুগে প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুর মদ্যপ অবস্থায় রাণী ভিক্টোরিয়ার শয্যাসঙ্গী হতেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এ ব্যাপারে (রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী জারিণার মত) কোন ছুঁতমার্গ

ছিলনা। ভারতবর্ষ থেকে একটি মুসলমান যুবক (করিম নামে) মহারাণীকে ভারতীয় ভাষা শেখাত, বয়সে ছোট কিন্তু সুদর্শন যুবক। আর যায় কোথায়। ভিক্টোরিয়া তাকে পাকড়াও করলেন। ইংলণ্ডের বাকিংহাম প্যালেসে যে কেউ প্রবেশ করতে পারেনা। করিম কিন্তু প্রথম সারিতে বসে উৎসব আনন্দ উপভোগ করতো।

রাজ নারায়ণ দত্ত খাবার টেবিলে বসে মদ খাবেন আর তাঁর ছেলে মাইকেল শুধু সাইকেল চড়ে ঘুরবে আশা করা যায় ?

রাজা রামমোহন রায় মদ্যপ ছিলেন কিনা জানা নেই। তবে তাঁর সুদের কারবার ছিল এবং বিবাহিত স্ত্রী ঘরে থাকা সত্ত্বেও জনৈক যবনী রক্ষিতা ছিল। এসব কে না জানে। সঙ্গে মদ থাকলে অধিকন্তু কিছু হত না। বাংলা মায়ের অ্যাংলো কালচারের প্রতিভূরা তো প্রকাশ্যে মদ ও গোমাংস ভক্ষণকে গর্বের বিষয় বলে মনে করতেন। ডিরোজিওদের কথা বলছি। বিদ্যাসাগর বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম। শ্রীরামকৃষ্ণ মদ্যপ গিরীশ ঘোষকে মদ ছাড়িয়ে ছিলেন। তিনি কারণ বারির পরিবর্তে নারকেল জল দিয়ে কালী পূজা করতেন।

অথচ স্বামী বিবেকানন্দকে আমেরিকায় গিয়ে মদ ও গোমাংস ভক্ষণকারী বলে প্রথমে দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। তখন অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ প্রয়াত হয়েছেন। জানিনা বিবেকানন্দ মদ খেতেন কিনা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে গান্ধীজীও এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তিনি মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করার জন্য বহু স্বেচ্ছাসেবক তৈরী করেছিলেন। কিন্তু ইংরাজ রাজ তো চায় বাল বাচ্চা সকলে মদ খাক। গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত নেহেরু একবার লণ্ডনে গিয়ে এক হোটেলে অনুপ্রবেশ করেন। ওঁর পান দোষ আছে কিনা জানার জন্য জনৈক সাংবাদিক

ছদ্মবেশে হোটেলে খাবার সাফ করার চাকুরি বেশ কিছুদিন আগেই গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ ওখানকার গোয়েন্দারা তাঁকে সহায়তা দিয়েছিল। সাংবাদিকের লেখা নেহরু সম্পর্কে —Nehru drinks little, but regularly. মালদহের জনৈক অধিবাসী আমাকে একটা ইকুয়েশন শুনিয়ে ছিলেন—গনিখান =মদখান।

এক সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় গনিখানের মদের বিল ছেপে প্রকাশ করা হয়েছিল। খান সাহেবের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি অতিথি আপ্যায়নের জন্য ওটা দরকার। বর্তমানে উনি মদ খান কি জানি না। কিন্তু মদ যে ওঁকে খেয়ে ফেলেছে তা ওঁর চাল চলন দেখলেই বোঝা যায়। বিখ্যাত বামপন্থী নেতা জ্যোতির্ময় বসু (প্রাক্তন সাংসদ) বর্তমানে প্রয়াত। ওঁর নাকি মদের কারবার ছিল। রাজা বাদশা বা জমিদারদের ক্ষেত্রে যেটা শোভনীয় গরীব গুর্বোদের কাছে লোভনীয় হবে না কেন? অবশ্য পানীয়টির মধ্যে তফাৎ আছে। কারুর অ্যাংলু, অন্যের বাংলু। উদ্দেশ্য অভিন্ন। মাতাল হওয়া, ভুলে থাকা।

হরিনাথ দে খেতেন। বেশ ভাল পরিমাণেই খেতেন। পুলিশ খাবে। মিলিটারী খাবে। ধনীরা খাবে। ব্যবসাদার খাবে। নেতারা খাবেন। যত দোষ ক্লাব সংগঠনের উঠতি যুবকদের। তারা 'মাল' খেলেই অচ্ছ্যুৎ। সরকার ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে তো তোল্লা দিচ্ছেন।

দেখা যাক বাংলা সাহিত্যের অতীত ও বর্তমানের দিকে। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক গোবিন্দলাল মদ্যপ অবস্থায় রোহিনীকে খুন করেছিল। শরৎচন্দ্র নিজেও খেতেন (মদ ছাড়াও 'পঞ্চরঙ'ও চলতো)। আবার তাঁর প্রিয় নায়ক দেবদাস তো মদ খাওয়ার জন্যই বর্তমানে হিন্দি সিনেমার জগতে জায়গা করে নিল।

যত মদ, তত খদ (খদ্দের) যার যেমন পয়সা, সে সে রকম

খাও। খেলোয়াড় শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, ডাক্তার কে না না খায় ?

সঙ্গীত অভিনয়ের জগতে মদ খাওয়া মানে বড় শিল্পী, বড় গায়ক বড় অভিনেতা তা বড় মাতাল। নজরুল থেকে সব্যসাচী, কবি জীবনানন্দ দাস ঋত্বিক ঘটক, অখিলবন্ধু, শ্যামল মিত্র। অন্য দিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তো সদ্যমৃত, বলাবাহুল্য মদ্যমৃত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খেলে দোষ নেই। তসলিমা খেলে দোষ কেন ? মহিলা বলে ?

'আপনি আচরি ধর্ম, শিখাও পরে' মদের ক্ষেত্রে এই গুরু বচন অর্থহীন। বর্তমানে যারা ল্যায়লং, যারা এয়ারে জাহাজে চাকরি করেন, তাঁরা অনেকে সস্ত্রীক পার্টিতে যান। সেখানে দুজনে মাতাল হয়ে পড়েন। শেষবেশ মেয়েদের মাজা ধরে টুয়িস্ট অথবা ব্রেকডান্স। বিয়ে বাড়িতে, পূজা প্যান্ডেলে ওটা আর কোন ব্যাপারই নয়। এখন ঘরোয়া বউরাও স্বামীদের বন্ধু সহযোগে বাড়িতে বসে মদ খাওয়া এ্যালাও করছেন। কেননা রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়বে, বমি করে ড্রেনে পড়ে থাকবে তাতে প্রাণ, মান দুই যেতে পারে। ফ্যামিলি প্রেস্টিজ আর ইনকাম দুটো গেলেই তো মুস্কিল। তার থেকে বাবা ঘরে ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে খাও। মস্তি করো। 'ড্রিংস' কথাটি বেশ কেমন সম্ভ্রম জাগায়। যত মদ, তত বদ—তা ঠিক নয়। আসলে যুগের হুজুগ্তি। প্রেমে, পিকনিকে মদ ফার্স্ট ও মাস্ট আইটেম। গায়ক খাবে। নায়ক খাবে। টেলিফিল্মে মদ খাওয়ার দৃশ্য নিত্য নিয়মিত। রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু ছাত্র লুকিয়ে যায়, ক্লাবের ছেলেরা দেখিয়ে খায়। দীঘায় চলে, পুরীতে চলে, তারাপীঠে পুরোদমে চলে। বেশি খেলে বমি, কম খেলে দুষ্টুমি।

মদ খাওয়া কি চরিত্রহীনতা ? মদ আজ শুধুমাত্র মানীয়দের

পানীয় নয়, আম জনতার। অতএব বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। চরিত্র কথাটির অর্থ ব্যাপক। খুন, ধর্ষণ, বধু হত্যা, অর্থ তছরূপ নানা ধরনের কাজের মধ্যে মদ অনেক সময় কমন ফ্যাক্টর হলেও সর্বক্ষেত্রে নয়। চরিত্র কথাটি নিয়ে আমরা ভারতীয়রা যতটা চিন্তা করি, য়ুরোপীয়রা ততটা করে না। কারণ ওদের কাছে ক্যারেকটার কিছু নয়, পারসোনালিটিই সব। মদ হল ভোট ও নোট কুড়ানর মাধ্যম। সাংসারিক জীবন ও পতিতালয়ের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের মত মদ সব কিছুর মধ্যে বেশ কেমন সমন্বয় করে দেয়। মদ দেহের ক্ষুধা আর মনের সুধা।

মদ লিভার, প্যাংক্রিয়াস নষ্ট করে। বেকারত্বকে, আইবুড়ো ভাবকে ভুলিয়ে দেয়। বেশি আসক্তি বেশ্যা শক্তি হলে শুধু মদে চলে না। তার সঙ্গে এসে যায় হেরোইন, চরস, ব্রাউন সুগার, পেথিড্রিন ইনজেকশন, ডেনড্রাইট ইত্যাদি। ব্লু-ফিল্মের সঙ্গে মদ যেন মনিকাঞ্চন যোগ। মদ বিরোধী মিছিল, শেষ পর্যন্ত মেদ বিরোধী মিছিলে পরিণত হবে। অতীতের পঞ্চমকারের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে মোবাইল, ম্যাসল ও মানি।

অল ইণ্ডিয়া লেভেলে বেশি প্রচলন MRP brand-এর ব্রাণ্ডি, হুইসকি, জিন, রাম, ভোদকা প্রভৃতি Strong Spirit যুক্ত এবং বিয়ার এর মত Soft Spirit যুক্ত মদ।

"বোম্বাই সে আয়া মেরা দোস্ত
দোস্ত দোস্ত পেয়ার করে।"

বোম্বাই থেকে দোস্ত আসতে পারে, মদের প্রয়োজন নেই কারণ একা সোয়ালেসই যথেষ্ট। এইবার কয়েকটা বাংলা ও হিন্দি (মদের গ্লাস হাতে নিয়ে) হিট করা গান দিয়ে লেখা শেষ করতে চাই। বলা প্রয়োজন প্রায় সব কটি গানই কিশোর কুমারের।

ক) এই তো জীবন
যাক না যেদিকে যেতে চায় প্রাণ

বেয়ারা চালাও ফোয়ারা
জিনসেরই শ্যাম্পেন রাম
(কিশোর কুমারের গান, উত্তম কুমারের লিপ)

খ) থোরি সিতো পিলিহে
চোরি তো নেহি কিহে
ওজ্নী...
(কিশোরের গান, অমিতাভ বচ্চনের লিপ)

গ) দে দে পেয়ার, পেয়ার দে (৩)
(কিশোরের গান, অমিতাভর লিপ)

ঘ) এমন বন্ধু আর কে আছে
তোমার মত মিষ্টি
কখনও বা ডারলিং
(হেমন্তর গান, অনিল চ্যাটার্জীর লিপ)

অতএব বাংলা বন্‌ধ বারে বারেই হতে পারে। বাংলু বন্ধের সম্ভাবনা আপাততঃ নেই। অ্যাংলুরও নয়। বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চলে ঠেক ভাঙতে গেলে পুলিশের ব্রেক ফেল করে যাবে।

1) Director's Specipal সব থেকে সস্তায় মদ 57·00 (Nip)
2) Royal Challange 104·00 (Nip)

বেণীকান্ত

শুন শুন শুন সবে শুন দিয়া মন
মহামতি বেণীকান্তর নাম সংকীর্তন।

ঘুমের মধ্যে বাংলা ব্যাণ্ড নাকি চন্দ্রবিন্দুর ব্যঙ্গ সংগীত? আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর ঐ গানের রেশ ধরেই স্বপ্ন দর্শন। মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন? পেট গরম হলে নাকি পাতলা ঘুম হলে। ডাক্তারের পরামর্শ নিতে গেলে ফিস লাগবে। প্রায় স্বপ্ন দেখি। যাকগে স্বপ্ন স্বপ্নই। সত্য তো নয়। কাল রাতের স্বপ্নটা প্রহসনের মত। ব্যাখ্যা করে বলছি। একটু অপেক্ষা করুন।

* * *

বেণীকান্ত। নামটাতে কেমন যেন খটকা লাগে। বেণী মাধব হতে পারতো। এমনকি বেণী সংহারও হতে পারতো। এখনকার উঠতি মাস্তানরা মেয়েদের টিজ করার জন্য বেণীতে কাঁচি চালায় তো। নাম বিভ্রাট অবশ্য চিরদিনের ব্যাপার। কলেজে পড়ার সময়ে আমার দুই বন্ধু ছিল। একজনের নাম গিরিজাশংকর সান্যাল ভট্টাচার্য (সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সামনে 'স্টাডিজ' বই-এর দোকানের মালিক)। বলতাম দাদা। আসলে বন্ধুর মত। আরেকজন হিমালয় নির্ঝর সিংহরায় সহপাঠী।

* * *

যে কথা বলছিলাম বেণী একাধারে নেতা ও অভিনেতা। উনি বেকার কিন্তু ভিক্ষা করেন না। বাড়িতে উপঢৌকন আসে। ভদ্রলোকের ছেলে তো ভিক্ষা করা সাজে না। তা বাদে নেতা। যে সে নেতা নয়। সম্ভ্রান্ত নেতা। পাড়ার লোকেরা ক্রমশঃ প্রকাশ্য হতে থাকায় গোপনে বলত বেণীকান্তটাও মদ, মহিলা ও

মানির বশ। মাঝে মধ্যে আবার লেখে। যা তা লেখা নয়। রীতিমত গবেষণামূলক লেখা। ইতিহাসের জনৈক শিক্ষক বললেন গবেষণার অর্থ হল যারা গরু জাতীয় তারা এপথে এসোনা। বেণীর লেখার ওপর ওঁর কটাক্ষ। বেণীর সতীর্থরা কেউ চোর, কেউ ডাকাত। বেণী ২য় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। পুলিশ প্রশাসন ওদের ভয় করে। কখনও বা দিয়ে যায়। বখরায় না মেলায় বন্ধুরা একবার ওকে ফাঁসিয়ে দেয়। বেণী আসলে ক্যাবলাকান্ত। হাতে নাতে ধরা পড়ে যায়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জনৈক নায়ক প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরুর দুধ খাবে, কিন্তু পয়সা দেবে না। পরের ধন বিনা পয়সায় ভোগ করার ওঁর নাকি জন্মগত অধিকার। বেণীও দুধ ও তামাকু খাবে একত্রে ফোকোটে। অতি বাড়ের ফলে একদিন বন্ধুদের চক্রান্তে বেণী হাতে নাতে ধরা পড়ে যায়। প্রাতঃ স্মরণীয় বেণী সমাজের লোকের কাছে নিন্দিত। নন্দিত বা বন্দিত লোক হঠাৎ নিন্দিত হলে যা হয়। লোকের ঘোর কাটে। পাড়ার লোকেরা তার প্রাতঃমরণ কামনা করে। বেণীর বায়োডাটা সংগ্রহ করে দেখা গেল সে যখন পাড়ায় কোয়াপরেটিভের কর্তাব্যক্তি ছিল তখন লবঙ্গ চুরি করতো। ব্যায়াম সমিতি থেকে ভারোত্তোলনের লোহা চুরি করতো। লাইব্রেরীতে বই চুরি করতো। অর্থাৎ জন্মগত ভাবেই চোর তবুও সে নেতা। সতীর্থরা এখনো সভায় ডাকে। বেণী কেমন যেন বোকা বোকা চোখে চেয়ে বসে থাকে। বেণী এখন রণক্লান্ত। ডাকাতি করে প্রচুর মালকড়ি কামিয়ে নিয়ে সাধু বেশে পাকা ডাকাত এখন সে। অর্থ তার কাছে অনর্থ নয়, বরং সদর্থ। একদিনের রক্তিম বর্তমানে শোষক। বেণী আসলে রাবড়ি প্রস্তুতকারক।

রাবড়ি কিভাবে প্রস্তুত করে জানেন তো? ফুটন্ত দুধের ওপরে বাতাস করে, তলায় জ্বাল দেয়। একাধারে গরম ও ঠান্ডা

করে। রাবড়ির উপাদান ঘন দুধ। বেণীর উপাদান বোকা মানুষ। নির্বোধ মানুষকে ক্ষেপায়, বিপ্লবের কথা শোনায়। গোপনে কারখানা মালিক আর প্রোমোটারদের কাছ থেকে নোট খায়। অসুস্থ বেণীর একবার প্যাথোলজি টেস্ট করা হয়েছিল। তার সমস্ত রকম বর্জ্য পদার্থে শুধুমাত্র নোট পাওয়া গেছে। মুদ্রা নয়। ইয়ার দোস্তরা তার প্যান্টে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে কিন্তু কোমর থেকে ওটি একেবারে খুলে নেয়নি। বর্তমানে তার হিমালয়ে গিয়ে সাধু হবার সময় হয়েছে, কিন্তু অসুবিধা আছে, অথচ যমালয়ে যাবার চান্স নেই। ভাগ্যিস এদেশে বিপ্লব হয়নি। অথবা হলে উনি রাশিয়ায় ব্রেজনেভের জামাই বা চেসেস্কু হতেন। কেউ ওর নাগাল পেতনা। সতীর্থরা বেজায় চালাক। ওর মত ক্যাবলাকান্ত নয়। যথা সময়ে ল্যাং মেরে ট্রাক থেকে হটিয়ে দিয়েছে। বেণীর একদিকে টাকা, অন্যদিকে ফাঁকা।

বেণী এই মুহূর্তে স্বখাত সলিলে। মাঝে মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গিয়ে Service করিয়ে আসে। এটা ওর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। চাকা ফুটো গাড়ি তো। কমেডিয়ান বেণী ট্রাজেডির নায়ক। কিন্তু মনে রাখতে হবে বেণী কিন্তু হেলে সাপ নয়। রীতিমত কেউটে, শীত ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও প্রয়োজন বোধে ছোবল মারতে পারে। তাই বন্ধুরা ওকে বেশী ঘাঁটায় না। ঘাঁটালে প্রত্যেকের গোপন ব্যাপার ওপন হয়ে যাবে। কেউই নগ্নবস্ত্র হতে চায় না। চায় না জেলের মধ্যে সহবাস। ছোট চুল, লম্বা চুলওলা কেউ চায়না বেণী সংহার হোক। অলম ইতি।

পিতৃদেব

বাবা স্কুল মাস্টার ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত ডিসিপ্লিণ্ডও। ভীষণ মিতব্যয়ী। আমরা ভাই বোন মিলে এগারো জন। আস্ত একটা ফুটবল টিম। খেতে বসে নিজেদের ভাই বোনেদের মধ্যে বলি—ভদ্রলোক টু মাচ কৃপণ। কেউ পড়ে। কেউ ফেল করে। কেউ ক্যারাটে শেখে। কেউ ক্যারাম খেলে। কেউ প্রেম করে। কেউ বিউটি পারলারে যায়। কেউ টুশনি করে। অর্থাৎ সংসারের সবটাই বাবার ঘাড়ে। নাম রাখার ব্যাপারে বাবা মায়ের কোন গরজ ছিলনা। বিশেষ করে ডাক নামের ব্যাপারে। আমাদের ডাক নামগুলো শুনুন একবার—বাঘ, ভাল্লুক, গেঁড়ি, মুড়ি, অড়ু, ভাঁড়ু, ঘুড়ি, লাটাই, মাঞ্জা, সুতো, ছিটকিনি। ঐ নামেই আমরা পরিচিত। মুড়িকে দেখতে ভাল। সে একটি জুটিয়ে নিয়েছে। গেঁড়ি কুৎসিত। ওর বিয়ে দিতে গিয়ে বাবাকে সোনা ও নগদে বহুত ঢালতে হয়েছিল। তা সত্বেও উনি পণ প্রথার সমর্থক। টাকা না ঢাললে গেঁড়ির বিয়ে হতনা। ফলে চিরদিন গলগ্রহ হয়ে থাকতো। আরে স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবও তো পণ নিয়ে ছিলেন বা কুলীন ব্রাহ্মণ বলে পণ পেয়েও ছিলেন। আমাদের পুরাণ প্রথার সব কিছুই বাতিল হয়ে যায় নি। কিছু ভাল মন্দ তো আছেই। এখন তো লাভ ম্যারেজ হলেও গোপনে কিছু ডিমাণ্ড ছেলের বাবারা করেও থাকে। অনেক ক্ষেত্রে লেন দেনও হয়। কিছুটা গোপন, কিছুটা ওপেন। বুঝলে মুর্খের দল।

*　　　*　　　*

একদিন বেলা ২টা নাগাদ একটা টেলিগ্রাম এলো বাবার নামে। দুর্ভাগ্য আমাদের। বাড়িতে এ পর্যন্ত মাত্র ২/৩টি

টেলিগ্রাম এসেছে। কোনটাই হঠাৎ বিয়ে বা কারুর ইনটারভিউ জাতীয় কোন ব্যাপার নিয়ে নয়। স্রেফ মৃত্যু সংবাদ।

বাবার সিদ্ধান্ত সকলের খাওয়া হয়ে গেলে তবেই টেলিগ্রামটি প্রকাশ করা হবে। যথা নির্দেশ। হ্যাঁ মৃত্যু সংবাদই বহন করে আনছে ঐ টেলিগ্রামটি। কোথাকার কোন আত্মীয় নাকি মারা গেছে। বাবা বিস্তারিত ভাবে কিছু বললো না। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য—অশৌচ।

আমরা দূরের আত্মীয়দের কথনো দেখিনি। নামও শুনিনি। কেউ ইনটারেস্টেডও নয়। এগারো দিন নিরামিষ খাওয়া বাধ্যতা মূলক। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবাই চামড়ার জুতো পরছে। তেল মাথছে। বাবার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু মাছ খাওয়া চলবেনা একমাত্র মাছের ওপর ভিজিলেন্স। মাছের বাজারে গেলে আশি টাকা কেজি স্টাণ্ডার্ড মাছের দাম। স্ট্রোক হবার উপক্রম হয়। ছোট ভাই-এর পড়াশুনা বিশেষ হয়নি। বাবার ধারণা ইংরাজি অংক কুলীন সাবজেক্ট। ও দুটোর একটাও না জানলে চাকরি হবে না। ওর দ্বারা অংক হবেনা। অগত্যা শেয়ালদার একটি নাম করা স্কুলে Spoken English এর ক্লাশে ভর্ত্তি করা হল। ছোট ভাই খেতে বসে গজগজ করে।

—ডালেক্কে ডাল, ডাল দুকুনে বড়া। একি রোজ রোজ গেলা যায়।

আমাকে জিজ্ঞাসা করল—কবে মরেছেরে?

—বাবা তো তারিখ বলেনি।

—নারে ভদ্রলোক মাছ কেনার ভয়ে অশৌচটা অন্যায় ভাবে লিঙ্গার করছে।

—বাবার দিকে চেয়ে বেপরোয়া ভাবে বলল—Let you please declare that অশৌচ is over। অশৌচের অজুহাতে বহুত পয়সা তো জমালে।

বাবা নিরুত্তর। মা শোবার ঘরে গিয়ে দরজাটা হাফ বন্ধ করে দিয়ে বাবাকে বললে—ছেলে মেয়েকে কতদিন আর জব্দ করবে। জানো ওরা মাছ ছাড়া খেতে পারে না। কালকেই মাছ এনো।

*　　　*　　　*

বাবা রিটায়ার্ড মানুষ। আদ্যাপীঠে গিয়ে পাঠ শুনতে মন বসেনা। বুড়োদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গেলে অনিবার্য্য ভাবে রাজনীতি এসে পড়ে। ভালবাসেনা। এড়িয়ে যায়। অগত্যা বাড়ি বসে টুশনি করা। সময়ও কাটে দুটো পয়সাও আসে। দেয়ালে সাইন বোর্ড টাঙানো হয়। বাবার নামের পাশে লেখা হল—এম. এ. (ক্যাল), বিটি (হুগ)। আমরা তো অবাক বাবার তো কোন ফরেন ডিগ্রী নেই। তবে 'হুগটা' কি? বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে বলল—ঐ যে হুগলী থেকে পাশ করেছিলাম।

হাসতে হাসতে তাড়ুর দম আটকে গেল।

ভাঁড়ু সাদা পাঞ্জাবী পরে চা খাচ্ছিল। বেচারার চায়ের এক ঝলকে পাঞ্জাবীর সামনের দিকটায় বিশ্রী ছোপ পড়ে গেল। বাবা সব সাবজেক্ট পড়ায় মাত্র একশ টাকায়। পড়ুয়াদের চা খাওয়ায়। বাথরুমে গিয়ে বিড়ি খায়। মার আপত্তি। বাবা বলে—মানুষকে একটু স্বাধীনতা দিতে হয়। অত খিটখিট করলে টুশনি ফ্লপ করবে। বর্ষা হলে ছাতা দেয়। কিন্তু ছাতা তো আর ফেরত আসেনা। চাইলে বলে ভুলে গেছি। বাবার বিজ্ঞান ক্লাস রীতি মতো উৎসাহ ব্যঞ্জক। উনি বোর্ড ওয়ার্ক করেন—H_2O মানে কি? দুইভাগ হাইড্রোজেন + এক ভাগ অক্সিজেনে জল। অর্থাৎ জ্বলনেওলা + জ্বালানেওলা = নিভা-নেওলা। ঠিক আছে। ছাত্রদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়। বাবার ২য় বক্তব্য বাংলা সম্পর্কে। লেখ কম কিন্তু বানান ভুল যেন

না হয়। বোর্ডের নিয়ম একটা বানানে এক নম্বর কাটা যায়। আচ্ছা বানান লেখ সঙ্গে মানেও লেখ।

*　　　*　　　*

একটি দ্রুতগতি ও প্রত্যুৎপন্ন মতি ছাত্র বানান মানে এক সঙ্গে লিখতে লাগল।

লেখ ঃ—

বানান	মানে
জলকেলি	জলের মধ্যে কেলান
অধ্যাপক	আধ পাকা
ব্রহ্মচর্য্য	বোম চার্জ
মদস্রাব	মদ খেয়ে পেচ্ছাব

অবশ্য বিশ্বকর্মার মানেটা লিখেও আবার কেটে দেয়। খাতা হাতে পেয়ে স্যার ক্লাশ টেনের এক বলিষ্ঠ ছাত্রকে ছাতা দিয়ে পেটাতে সুরু করেন। যত মার খায়, তত হাসে। আমরা সপরিবারে পড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গেলুম। কিছু বলার জো নেই। হঠাৎ দিদি কেঁদে উঠলো।—আমার ছাতাটা গেল। হাস্যরস একটু প্রশমিত হলে জনৈক ছাত্র বলে ওঠে বানান মানে ছাড়ুন স্যার ওটা লিখতে লিখতে অভ্যাস হয়ে যাবে। সমাস ধরুন।

সমাস শিখতে ছমাস লাগে।

বাবার উত্তর—লেখ। বহুব্রীহি ও কর্মধারয় সমাসের কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। ব্যাসবাক্য ভেঙে সমাস শিখতে হবে কিন্তু। মুখে মুখেই।

বল—বগলানন্দ

উত্তর—বগল চুলকে আনন্দ-মধ্যপদ লোপী সমাস।

বিশ্বকর্মা—বিশ্বকে করে যে।

হতভাগা। আবার মার।

এবার বেদম ঠাঙানি। বেকায়দায় পড়ে যে যার দৌড় মারল। বেকায়দায় পড়ে মেয়েগুলো প্রায় বন্দি। বাবা ওদের ছেড়ে দিলেন। অভিযুক্ত ছাত্রটি দারুণ খুসী। ওর সিনেমার টিকিট কাটা ছিল। ভুল করে পড়তে এসেছি। সে দারুণ খুসী।

আমীর সাহেব

আসলে হিন্দু ব্রাহ্মণ। ছেলে মেয়েরা বাবাকে ঐ নামে ব্যঙ্গ করতো। বাবার স্টাইল অব লিভিং দেখে। উনি নাকি সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশোদ্ভব। প্রাক্তন জমিদার নন্দন। এখন কার্য্যতঃ জমাদার। পুত্র কন্যাদের অভিমত তাই। অবস্থায় ফকির। অথচ চাল চলনে আমীর। পুরানো কিছু শেয়ার; ফাঁকা জমি বিক্রয় আস্তে আস্তে কিছু রস জোগাচ্ছে। তার ওপরেই ফুটানি। সারাদিন 'র কফি' আর ফাইভ ফিফটি সিগারেট খান। গভীর রাত্রে দামী বিলাতী মদ। রাত ৯টা নাগাদ বিরিয়ানী ও রেওয়াজি খাসির মাংস। ক্রিকেট খেলা ভালবাসেন। ওঁর ধারণা ফুটবল ছোট লোকেদের খেলা। গান বলতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকেই শ্রবণ যোগ্য মনে করেন। ওঁর প্রিয় শিল্পী রসিদ খান। অর্থাৎ সব ব্যাপারেই জমিদারী স্টাইল। কিছু বাড়ি ভাড়া ও স্ত্রীর গহণা ওঁর আমিরি চালের রসদ যুগিয়ে যাচ্ছে। ওঁর ফাঁকা জমি ও পুকুর বুজিয়ে বহুতল বাড়ী উঠছে। টাকা আসছে। কিন্তু উনি যে সপরিবারে বহুতলের তলানিতে ডুবে যাচ্ছেন সে বিষয়ে উদাসীন।

* * *

এহেন বদ্যিনাথ বাবু সুস্থ থাকলে আতর মেখে, গিলে করা পাঞ্জাবী পরে, ধাক্কা পাড়ের কোঁচা দুলিয়ে, হাতে পালিশ করা ছড়ি নিয়ে বিকালে এক রাউণ্ড চক্কর দিতেন। হাতে যখন পয়সা ছিল তখন বন্ধু বান্ধব বা নিকট আত্মীয় কারুর বিয়ে হলে ভারি সোনার গহণা অথবা অলউইনের ১৪0 লিটারের ফ্রিজ নিয়ে রাজকীয় পোষাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন। ব্যস ঐ পর্য্যন্তই

পংক্তি ভোজন তো নয়ই। এমনকি স্বতন্ত্রভাবে খাবার ব্যবস্থা করলেও খেতে রাজি হতেন না। খুব ধরাধরি করলে মাত্র এক কাপ 'র' কফি নিতেন।

বাড়ি ফিরে নিজের পছন্দের খানা খেতেন। রিচ খাওয়া ও নিয়মিত মদ্য পানের ফলে এক সময়ে লিভারের রোগে আক্রান্ত হন।

পুত্রকে ডেকে বলেন—সম্রাট এমন একজন ডাক্তার ডাকো যার হাতে কোন রোগী মারা যায়নি। ছেলের নাম সম্রাট।

সম্রাট বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে গম্ভীর মুখে বাবাকে বলল—প্রকাশ্যে তো আর ঐ ভাবে কোন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। যে ভাল ট্রিটমেণ্ট করে তার সম্পর্কেও খবর নিয়েছি, বেশ কয়েকজন ওঁর চিকিৎসায় থাকতে থাকতেই মারা গেছে।

বৈদ্যনাথ—কলকাতায় গিয়ে খোঁজ কর। মোবাইলটা সঙ্গে নিয়ে যাও।

ঘণ্টা খানেক বাদে ফোন এলো—বাবা একজন তরুণ এফ. আর. সি. এস ডাক্তারের সন্ধান পেয়েছি। খুব নাম। বিশাল ডিগ্রী। তবে প্রাকটিস করছেন অল্প দিন। রোগী মারার ব্যাপারে পাশের ওষুধের দোকানে কনফিডিন্সিয়ালী জানতে চাইলাম। দোকানদার বললেন খুব ভালো ডাক্তার, সম্ভবতঃ ওঁর হাতে মাত্র একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

বৈদ্যনাথ—ঠিক আছে, ওঁকেই নিয়ে এসো।

* * *

তরুণ সপ্রতিভ ডাক্তারকে দেখে বৈদ্যনাথ বাবুর ভালো লাগলো। প্রেসক্রিপশন করে অল্প ওষুধ দিলেন। খাবার ব্যাপারে জোর রেসট্রিকসন করে দিলেন।

বৈদ্যনাথবাবু—বয়েস তো কম। কতদিন প্রাকটিস করছেন?

ডাঃ—আগে হসপিটেলে ছিলাম। চেম্বারটা মাসখানেক খুলেছি।

বৈদ্যনাথ—বলেন কি মশাই এক মাসের মধ্যেই একজনকে মেরে ফেল্লেন ? অ্যাঁ ?

ডাঃ ফিস নিয়ে চলে গেলে সম্রাটের মুণ্ডপাত করতে লাগলেন ওর বাবা।

* * *

পরের ঘটনা। সম্রাট তখন বলে—তোমার বন্ধু অতুল ডাক্তারকে ডাকি না। ওঁর অভিজ্ঞতা তো প্রচুর। হলেই বা এল. এম. এফ।

—ডাক দেখি, ভীষণ পেন হচ্ছে।

টেলিফোনে না পেয়ে সম্রাট ওঁর বাড়ী চলে গেল। ডাক্তার বাবুর শরীর খুব খারাপ ছিল। হাই প্রেসারে ভুগছেন তবু বন্ধুর অসুখ শুনে চলে এলেন।

* * *

বৈদ্যনাথ বাবুর বাড়ি এসেই প্রচণ্ড ভাবে ঘামতে সুরু করলেন। দোতালার অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠেছেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললে—পাখাটা জোর করে দাও। পরের দৃশ্য খুবই মর্মান্তিক। ওঁর চোখ ঘুরছে। বৈদ্যনাথ স্বয়ং তোয়ালে দিয়ে ঘাম মোছাতে সুরু করলেন।

বল্লেন—ওঁর ছেলেকে ডাক।

ছেলে আসার আগেই সিভিয়ার স্ট্রোক। সব শেষ।

ষড়যন্ত্র। গভীর ষড়যন্ত্র। বন্ধু হত্যা ! অবাক কাণ্ড। পাড়ার কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, তৃণমূল সব দলের ছেলেরা এসে বৈদ্যনাথ বাবুর বাড়ি ঘিরে ফেলল। ঝাণ্ডা, ডাণ্ডা শ্লোগান সবই সুরু হল।

সম্রাট আত্ম রক্ষার্থে পুলিশ ডাকলো। প্রায় ঘণ্টা খানেক

ধস্তা ধস্তির পরে ডাক্তার বাবুর ছেলে পুলিশকে শান্ত কণ্ঠে বলল—বাবার হার্টের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। বেড রেস্টের কথা। শুধুমাত্র একান্ত বন্ধুর অসুখ শুনে দৌড়ে এসেছেন। সম্রাট আমার বন্ধু। অন্য একজন ডাক্তার বাবুকেও ডাকা হয়েছে। ওঁর রিপোর্ট কি বলছে দেখুন—সিভিয়ার হার্ট এ্যাটাক। করার কিছু ছিলনা। খুনটুন কিছু নয়। জনতা তবু নড়বে না। ফলে পুলিশের লাঠি চার্জ। দু চারটে পটকা ফাটলো। অবশেষে পুলিশের গাড়ি মুক্ত হল।

ডাক্তারের ডেড বডি নিয়ে ওঁর ছেলে বাড়ি গেল। সম্রাট সঙ্গে দৌড়াল।

বৈদ্যনাথ বাবু স্ত্রীকে বল্লেন—জীবনে মরণে আমার জন্য আর ডাক্তার ডাকতে হবে না। দাও এক কাপ 'র' কফি।

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে

বেশ কয়েক বছর আগে, সম্ভবতঃ ষাটের দশকে জলপাইগুড়ি যেতে হলে সকরিগলি ঘাট ও মনিহারি ঘাটের মধ্য দিয়ে কিছুটা জাহাজ চড়ে যেতে হত। এখন ডাইরেক্ট রেল লাইন হওয়ার জন্য ঐ অসুবিধা দূর হয়ে গেছে। জলপাইগুড়ি যাচ্ছিলাম একটি শিক্ষা সম্মেলনে যোগ দিতে। ধুতি পাঞ্জাবী পরে ফেরার পথে দার্জিলিং এ গিয়ে মে মাসের শীত কাকে বলে বুঝে এসে ছিলুম। জাহাজে চড়ার অভিজ্ঞতা সেই প্রথম। ভারি সুন্দর লাগছিল। যাত্রীদের অনেকেই জাহাজের রেলিং ধরে জলের ঢেউ দেখছিলেন। আমরাও ছিলাম। জনৈক মহিলা দামাল একটি ছেলে কোলে নিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকে ঢেউ দেখতে গিয়ে একটু অসতর্ক হয়ে পড়েন। কোলের ছেলেটি জলে পড়ে যায়। পাগলের মত উনি চিৎকার করে উঠেন—বাঁচাও বাঁচাও, আমার ছেলেকে বাঁচাও। জাহাজে হৈহৈ পড়ে গেল। কিন্তু ছাত্র, যুবা, প্রৌঢ় কেউই নামছেনা। সবাই দর্শক। ঠেলা ঠেলি, হুড়োহুড়ি, গোলমাল কিন্তু জাহাজের ডেকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। হঠাৎ একজন শক্তপোক্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিশোর নয়, যুবক নয়, প্রৌঢ় একজন। জাহাজ অবশ্য থামান হয়ে ছিল। ভদ্রলোক দুরন্ত স্রোতের মধ্য দিয়ে ছেলেটিকে খুঁজে বার করে জাপটে ধরার পরে কাঁপতে কাঁপতে জাহাজে উঠে এলেন।

মায়ের কোলে ছেলে ফেরত দিলে যতটা আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় তা কিন্তু তাঁর চোখে মুখে লক্ষ্য করা গেলনা। জিরো থেকে হিরো হওয়া সত্ত্বেও বেশ কেমন নির্বিকার। বাচ্চার মার প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পা ধরে সেকি কান্না!

*　　　　*　　　　*

অথচ ভদ্রলোক নির্বিকার। জাহাজের ক্যাপ্টেন এসে ভদ্রলোককে উষ্ণ আলিঙ্গন করে ঘোষণা করলেন যাত্রীরা যেন জাহাজ থামলে দশ/পনেরো মিনিট অপেক্ষা করেন। ভদ্রলোকের সম্বর্দ্ধনা সভা হবে। মৃত্যু তো নয় তাই স্মরণ সভা নয়, হবে বরণ সভা। ক্যাপ্টেনের প্রস্তাবে সকলেই আগ্রহে সম্মতি জানান।

*　　　　*　　　　*

বরণ সভার জন্য মালা মিষ্টি ছোট খাটো উপহার এলো।

বাচ্চার মা ক্যাশ কিছু টাকা দেবার প্রস্তাব করায় উদ্ধারকারী ভদ্রলোক তীব্র ভাবে আপত্তি জানালেন। বক্তা প্রধানতঃ ক্যাপ্টেন, তাঁর ভাষণ—

বন্ধুগণ অপ্রত্যাশিত একটি দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। জাহাজে তো অনেক যুবক ছিলেন। তাঁরা যখন নির্বিকার তখনই নিজের জীবনকে বিপন্ন করে এই প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক জলে ঝাঁপিয়ে পরেন। এবং কি ভীষণ রিস্ক নিয়ে মায়ের কোলে তাঁর বাচ্চাকে ফিরিয়ে দেন। এটা একালের যুবকদের যেমন লজ্জা, বৃদ্ধদের তেমনি গৌরব। আসুন আমরা সকলে মিলে এই মহান মানুষটি স্মরণীয়. বরণীয় করে নিই।

জোর হাততালি। তারপর একে একে উপহার প্রদানের পালা। ওঁর দীর্ঘায়ু কামনা করা হল। মালা, মিষ্টি, কত কি হল। টেবিলে গলায় মালা পরা ভদ্রলোকের বক্তব্য—আমি কিছু বলতে পারি ?

—নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনার ভাষণ শুনবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব।

ভদ্রলোক—মায়ের অসতর্কতার জন্য যখন বাচ্চাটি জলে পড়ে যায় তখন সকলের মত আমিও দর্শক ছিলাম। জলে ঝাঁপ দেবার

কোন অ্যাডভেঞ্চার আমার মাথায় কাজ করেনি। অবাক হলাম একজন যুবকও এগিয়ে এলো না দেখে। আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানকার রেলিংটা অপেক্ষাকৃত নিচু ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে একটা লাথির গুঁতো খেলাম। টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে গেলাম।

পড়েই যখন গেছি, তখন আপ্রাণ চেষ্টা করে ছেলেটিকে রক্ষা করলাম। কাজেই সাহস বা কৃতিত্ব আমার নয়। তাই কবি গুরুর ভাষায় বলি—এ মনিহার আমায় নাহি সাজে। রন্দা যিনি মেরে ছিলেন, তিনি যদি হিম্মৎদার হন এগিয়ে আসুন। তাঁর হাঁটুতে আমি আমার কণ্ঠের মালা পরিয়ে দেবো। সমবেত হাস্যধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হয়ে গেল।

চলমান লেপ

নন্দন, চন্দন দুই ভাই। ওদের মাসতুতো দিদির বিয়ে। মাসির আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ছেলেরা স্কুলে কেউ ফেল করে। কেউ স্কুল পালিয়ে ফুটবল খেলে। কেউ বেকার। মেয়েরা তুলনায় ভালো। পড়াশুনা করে। মাকে রান্না ঘরে সাহায্য করে। উল বোনে। ব্লাউজ বানিয়ে বিক্রী করে। সংসারে পয়সা দেয়। অভাবের সিন্ধুতে বিন্দু বিন্দু শিশির কণার মত সাহায্য দানে সমস্যার সমাধান হয় না। সংসারের অভাব মেটাতে মেসোকে সারাদিন খাটনির পরে আবার ওভারটাইম করতে হয়। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পুরুষের দুটি দৈহিক অলংকার টাক ও ভুঁড়ি দুটিরই অধিকারী উনি। ওদের মাসি বরানগরের বাসিন্দা। বেজায় মোটা ও মেদ বহুল মাসিকে (মায়ের অনুপস্থিতিতে) চন্দন বলে—মাসি তো নয় যেন পাটনাই খাসি। মেসো ছেলেদের হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ধার দেনা করে এক একটি করে মেয়েকে পার করছেন। ছেলে মেয়ে সাকুল্যে এগারো জন। আস্ত একটি ফুটবল টিম।

৩য় কন্যা সুজাতার বিয়ে। অগ্রহায়ণ মাস। কড়া শীত। এখনকার অগ্রহায়ণ মাসের মত আম গাছের ডালে কোকিল ডাকা আলতো শীত নয়। মাসি আর মেসোর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। মেসো সাদাসিধে দিলখোলা মানুষ। দারিদ্রকে ওপেন করতে দ্বিধা করতেন না। মাসি দারিদ্রকে গোপন করতে ভাল বাসতেন। মেসো অবশ্য আত্মীয় বন্ধুদের কাছে কিছু চাইতেন না। কিন্তু আত্মীয় বন্ধুরা ওদের বাড়িতে বিয়ে বা অসুখ হলে যে যার সাধ্যমত সাহায্য করতো।

দারিদ্রের বিষন্নতা ঢাকবার জন্য মাসি দুপুরে বসে ছেঁড়া

গামছা পর্যন্ত সেলাই করতেন। মাসি মুখে অবশ্য মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার জাতীয় গল্প করতে ভাল বাসতেন। বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এসে মাসি বলেন—রাত্রে থেকে যেতে হবে। নন্দু চন্দু তোদের কাজ আছে। বর যাত্রীদের প্রায় সবাই খেয়ে চলে যাবে। তাছাড়া আমি কিছু লেপ ও মশারী ভাড়া করেছি। শোবার অসুবিধে হবে না। বিয়ে সন্ধ্যা রাত্রে। বরানগর থেকে দক্ষিণেশ্বর এমন কিছু দূরত্ব নয়। সাইকেলেও চলে আসা যায়। মা অবশ্য থেকে যাবে সপ্তাহ খানেক।

—না তা হবেনা তোদের সকলকেই থাকতে হবে।

—যথা আজ্ঞা। সবকিছু মিটতে রাত্তির বারোটা হল। তারপর শয়নের পালা। মাসির সেই লেপ মশারীর বিজ্ঞাপনের নাম গন্ধ নেই। অবশেষে একটা চকচকে লেপ এলো। বালিশের বদলে টেবল থেকে দুটো ডিকসনারী মাথায় দিয়ে দুই ভাই শুতে যাচ্ছে এমন সময়ে মাসির আবির্ভাব।

—এই দেখ দরজায় খিল দিসনা। বিয়ের জিনিষ পত্র অনেক কিছু এ ঘরে আছে, কখন কোনটার দরকার হয় বলা যায় না তো। তোরা দরজা ভেজিয়ে শুবি। নন্দন চন্দন চুপচাপ শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে মাসির ডাক আস্তে করে—জেগে আছিস তোরা? সাড়া দিল হাঁ। আবার কিছুক্ষণ পরে একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি। বারবার তিনবার। তারপর দুইভাই মিলে ঠিক করলে কিছু একটা রহস্য আছে।

—এবার এলে সাড়া দেবোনা। বরের বন্ধুরা গান গাইবে বাসর ঘরে। হারমোনিয়াম আছে নাকি ঐ ঘরে। অথচ হারমোনিয়ামের চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না।

—এবার দুইভাই মিলে ঠিক করলো আর সাড়া দেবেনা। দেখা যাক না কি করে।

সবেমাত্র ঘুম এসেছে আবার মাসির ডাক। ওদের একজন নাক ডাকার ভঙ্গি করলো। ব্যস আর যায় কোথায়।

*   *   *

যথারীতি কিছুক্ষণ পরে আবার মৃদু ডাকাডাকি। উত্তর নেই। মাসি খুব সন্তর্পণে ওদের বিছানার কাছে এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে ওদের গা থেকে লেপ খানা সরিয়ে নিয়ে দে চম্পট। দুজনে মড়ার মত পড়ে আছে। একটু পরে সেকি হাসি। লেপটা আসলে ওদের জন্য নয়। ওটা পোজিং। এতক্ষণ পরস্পরের মুখ চেপে ধরে ছিল। এবার নব দম্পতির মত দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে প্রবল হাসিতে ভেঙে পড়ল। তারপর দরজায় খিল দিয়ে সিগারেট ধরাল দুজনে। বাইরে গেলে ওরা একত্রে ধূমপান করে। দরজায় খিল দিয়ে বাকি রাতটা কোনক্রমে কাটিয়ে দিল। ভেতরে অন্তর্বাস থাকায় লুঙ্গিকে যতদূর সম্ভব বুক অব্দি টেনে নিয়ে রাত কাটাল। ভোরে কাউকে কিছু না জানিয়ে খুব সন্তর্পণে একবার নন্দু বাসর ঘরে দিকে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলো। ওঃ সে কি দৃশ্য। যেন অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। নতুন সেই লেপটা যথা স্থানে বিরাজমান অর্থাৎ নবদম্পতির গায়ে।

ওটি মাসির কম্ম। লেপটি সম্ভবতঃ অনেক ঘরেই টাচ করতে করতে উপযুক্ত স্থানে অবস্থান নিয়েছে। সত্যিই তো সেদিনের প্রধান আকর্ষণ বরবধু। বাকি সব লোকেরাই ফালতু।

*   *   *

এক সপ্তাহ পরে মা বাড়ি ফিরলে নন্দু চন্দু এক সঙ্গে মাকে দেখে বলে উঠলো—তোমার বোন ইতর।

মা—তোর বাবা ছুতোর। ঐ যে কাঠের কাজ করতো।

—কিছু না শুনেই হল্লাহল্লি। আগে শোন ম্যাটারটা কি হয়েছে।

সব কিছু শুনে মা বেচারা চুপসে গেল।

অজাযুদ্ধ

সংস্কৃত সাহিত্যে একটা শ্লোক আছে—

"অজাযুদ্ধ ঋষি শ্রাদ্ধ, প্রভাতে চ মেঘাড়ম্বরং"

অর্থাৎ ছাগলের লড়াই-এ শিং তোলার কায়দাটাই বড়। বীর বিক্রমে লাফিয়ে উঠে টুক করে মাথায় ঠেকায়। মুনি ঋষিদের শ্রাদ্ধে বড্যাড়ম্ব যতটা থাকে, শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়া ততটা নয়। আর সকালের আকাশে ঘনঘটা করে মেঘ করলেও সারাদিন বৃষ্টি হবে এমন কোন গ্যারাণ্টি নেই। অর্থাৎ তিনটে ঘটনাই পোজিং সর্বস্ব। প্রকৃত ব্যাপারে অনুপ্রবেশ শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই থাকে না।

* * *

তিন ছেলের বাবা হওয়ার সংবাদে গগনবাবু ধন্য। মেয়ে নেই। লম্বা চওড়া তিন তিনটে ছেলেই ওঁর পরিবারের স্তম্ভ। চাকরি করে না কেউ, ব্যবসা। কিসের ব্যবসা কেউ জানেনা অথবা সকলেই জানে কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলে না। টাটা-সুমো, হিরোহোণ্ডা টেলিফোন, মোবাইল সব কিছুই আছে। ওদের বিহার সর্বত্র। আগে ছিল ঘাস। এখন দলের দৌলতে আছোলা বাঁশ। রাতের অন্ধকারে ওদের কারবার। মধ্যাহ্নের অন্ধকারে চোখ লাল করে ঘুমায়। কালীপুজোয় ওদের অনাসক্তি। ওটা ছোট মস্তানদের পুজো। ঘটা করে রাস্তা জুড়ে জগদ্ধাত্রী পুজো করে। কাঙালী ভোজন, বালক ভোজন, দান ধ্যান সব রকমের আইটেম থাকে। বোতল ওদের নিত্য সঙ্গী। মদ, মহিলা এবং মানি ওদের উপজীব্য। পাড়ার লোকেরা গোপনে বলেও।

* * *

গগনবাবু পুরোহিত। এক সময়ে সামান্য একটা চাকরি করতেন। এখন জনকল্যাণের জন্য পুজো করেন। ওতে মানুষের মঙ্গল হয়। লক্ষ্মী বা নারায়ণ পুজোর দিনে সাইকেল চড়ে বাড়িতে পুজো করতেন। 'ওয়ান ডে ম্যাচ'। ওভারটাইমের মত। একদিনের বেতনের চেয়ে ইনকাম বেশীই হত। অফিস কামাই করতেন। পেটুক ব্রাহ্মণ। বর্দ্ধমানের মেমারিতে ওঁদের আদি নিবাস। সেখানে মেমারিটুকু রেখে শুধুমাত্র উদর নিয়ে ২৪ পরগণায় ওঁর অনুপ্রবেশ। কথায় আছে ব্রাহ্মণস্য উদরঃ। মধ্যপ্রদেশ ছাড়া ওঁর দেহের অন্যান্য অংশ বিশেষ কাজ করে না। ছেলেরা অবশ্য যোগান দেয়। থ্রি ম্যাস্কেটিয়ারস রত্ন বিশেষ। একদিন শিষ্য বাড়িতে যান এবং বাসি দুধ দিয়ে ব্রেকফাষ্ট করেছিলেন। পুজোর পরে পাতলা খিচুড়ী ভক্ষণ করলেন অম্লান বদনে। আর যায় কোথায়। সাইকেল চড়া অবস্থাতেই তীব্রবেগে পাইখানা চেপে যায়। পাগলের মত দিশেহারা গগন পুরুত পাইখানায় প্রবেশ করেন। নামাবলির খুঁটে বাঁধা নারায়ণ সহ। হঠাৎ পাইখানা নির্গত হওয়ার হড়হড় শব্দের মধ্যে ঢক করে একটা আওয়াজ শোনা গেল নামাবলির খুঁট থেকে শালগ্রাম শিলার অন্তর্ধান। নারায়ণ লণ্ট। উনিই তো ক্যাপিটাল অন্ততঃ পুজোর ব্যবসাতে। তাড়াতাড়ি শৌচকর্ম সেরে ঘর্মাক্ত কলেবরে গগনবাবু হাত চালিয়ে দেন প্যানের মধ্যে। নারায়ণ আর সোনা দানা স্থানে অস্থানে যেখানেই পড়ুক শুদ্ধ করে নেওয়া যায়। শাস্ত্রের অনুমোদন আছে। কচাৎ করে এক ঝলক বিষ্ঠা মিশ্রিত জল ওঁর চোখে ঠোঁটে আছড়ে পড়ল। ভাগ্যিস কোষ্ঠ কাঠিন্যের জন্য ওঁর মলের অগ্রভাগ শক্ত ছিল। অনেক কষ্টে নারায়ণকে ঐ অসহায় অবস্থান থেকে উদ্ধার করা গেল। পূতিগন্ধময়, চন্দন চর্চিত (সরি মল মিশ্রিত) শালগ্রাম শিলা। প্রথমে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিলেন। পাম্প চালান হয়নি সকালে জল বেশি নেই।

প্রথমটা পেচ্ছাব দিয়ে ধুলে হয় না? মলের ওপর মূত্র। অভিশাপ লাগবে। ব্যাপারটা কারুর কাছে লিক করলেন না। গোপন জিনিস ওপন করলেই সমস্যা। স্নান সেরে গোপনে গঙ্গাজলে ধুয়ে পবিত্র করে নিলেন নারায়ণকে। দেবতাকে বাদ দেবার কোন ব্যাপার নেই। স্বয়ং রামকৃষ্ণও তো ঠ্যাং ভাঙ্গা শ্রীকৃষ্ণকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন।

* * *

গগনবাবুর তিন ছেলেই তো অশুদ্ধ। তাদের বিশুদ্ধ করার উপায় তো এত সহজ নয়। উনি ভগবান ও ভাগ্যে বিশ্বাসী। ছেলেরা মাস্তান তাই দল নির্ভর। ভাগ্য ভগবান তাদের কাছে ব্যাক ডেটেড। একজন জেলে গেলে অন্যজন ছাড়িয়ে আনে। ওপর তলায় ওদের বেশ প্রভাব আছে। পুলিশকে ফুলিশ বানাতে ওদের মত কায়দাবাজ আর কেউ নেই। তাছাড়া ওদের দাপটে পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য ভয় পায়। ডাকাত, গুণ্ডা, মদ্যপ। তিন সন্তানের জনক নির্বিকার। অ্যাকশন করে বাড়ি ফিরলে বলেন বাথরুমে গিয়ে স্নান করে গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে তবে ঘরে ঢুকবে। ছেলে ইসারা করে মাকে দেখায়—দেখ বাবার লুঙ্গি কিন্তু হলদে হয়ে গ্যাছে।

—ওটা দেহের ব্যাপার মনটাই আসল। গগনবাবুর বিশ্বাস তাই।

শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে আর রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে চিত্ত শুদ্ধির জন্য কাশীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মনকে পরিস্কার কর। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিনীকে হত্যা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সবই তো সমাজের ভয়ে। গগনবাবু কি করবেন। ছেলেরা তো ফ্যামিলীর ফাইনানস্যার। উনি যে ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধ পুত্রস্নেহে মসগুল। ওঁর স্ত্রী অবশ্য মাঝে মাঝে গান্ধারীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ছেলেদের জ্বালায় এখন আর পড়াশুনা করতে পারেন না। জেলখানা নাকি শোধনাগার। তাই বলে বাপ হয়ে তো আর আগ বাড়িয়ে ছেলেদের জেলে পাঠান যায় না। কাগজে লেখালিখি হওয়ায় একবার বেকায়দায় পড়ে একটির জেল হয়। কিন্তু রোজগার তো কমে যায়। যাক গণতন্ত্রের দেশ তো। কিছুদিন থাক। আবার ফিরে আসবে। লোকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন আমি তো আগেই ওকে ত্যাজ্যপুত্র বলে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি। বাড়িতে পুলিশ এলো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

পুলিশ—অবাধ্য ছেলেকে আগে থেকে কণ্ট্রোল করেননি কেন। জানেন ওর বিরুদ্ধে কত কেস ?

গগনবাবুর উত্তর—কেস যতই থাক, আমি তো ওর কাছে মেষ মানে ভেড়া। তাছাড়া ফ্যামিলী থেকে আউট করে দিয়েছি তো ?

—এত লেট কেন ?

—ডিসিশান নিতে পারছিলুম না। হাজার হোক ছেলে তো। আপনার ছেলে নেই ?

—বেকার ছেলেরা এত টাকা পায় কোথা থেকে জানতে চাইতেন না ?

—আরে বাবা নেতারা তো ভোট পেয়েই খুশী। ছাপ্পা না বুথ দখলের ভোট তাতো ভাবেন না। গণতন্ত্রের এমনি মহিমা।

—বাজে বকবেন না। চলুন পুলিশ ষ্টেশনে।

পুলিশভ্যানে উঠে গগনবাবু ভাবতে থাকেন যিশুকে তাঁর প্রিয় শিষ্যরাই ফাঁসি কাঠে চড়িয়ে ছিল। আমি তো শিশু। কিন্তু যিশুর পাবলিক রিলেশন ছিল না। ওঁর ছেলেরা তো জননেতা। জনগণের শৃঙ্খল মোচনে ওরা অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই মাঝে মধ্যে ওদের শৃঙ্খল পোরতে হতেই পারে। আসলে অশুদ্ধ

হলেও বাপ তো বিশুদ্ধ। বড়টি খুন, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের জন্য মাত্র ত্রিশ / তেত্রিশ বছরে মেগালিডার হিসাবে অভিষিক্ত হয়েছে। মেজটি মদ, মহিলা ও মানির প্রতি আসক্ত। প্রথমটি গড। দ্বিতীয়টি ডেপুটি গড। ছোটটির ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে। পেঁদানী, ছেনতাই আর মহিলা উত্যক্ত বা তোলাবাজি করতে শুরু করেছে সবে মাত্র। তবে হাঁ প্রয়োজনবোধে ওরা জার্সি বদল করতেও পারে। যাঁর ছেলেরা হিরো তার বাপকে তো কিছুদিন জিরো হতেই হবে। লোকে বলে দুকান কাটা। আরে কান থাকলে তো কাটাই যেতে পারে। এই তো স্বয়ং জগন্নাথের হাত নেই। উনি হাত দিয়ে খেতে পারেন না। সন্তুষ্ট হলে মানুষকে হাত তুলে আশীর্বাদ করতে পারে না। এমন কি ভাই বোন বলরাম বা সুভদ্রা অন্যায় করলে আঙ্গুল তুলে শাসনও করতে পারেন না। তবু তো উনি জগতের নাথ। ঠুঁটো হলেই বা কি। ওরা নেতাদের কমিশন দেয়। সংসারে ক্যাস দেয়। (ওর মা কাছে নেই বলে বলছি) যদি পুলিশের থার্ড ডিগ্রির চোটে মৃত্যুও হয় তবে ওদের অ্যাস নিয়ে নেতারা তো মিছিল তো করবে। স্মরণ-সভা করবে। সেটাই বা মন্দ কি ?

গগনবাবু পুরোহিত। শিষ্যদের মঙ্গল কামনা ওঁর উপজীব্য। ছেলেরা নেতা, তদীয় নেতাদের তৈল মর্দনে কোথায় হয়ত ত্রুটি ছিল। তাই এত হুজ্জুতি। সবটাই তো তোদের প্রাপ্য নয়। বে আইনির ফল তো ভোগ করতেই হবে। লড়াই লড়াই খেল। সত্যি লড়াই তো না। তাহলেই পটকে যাবে। নেতারাও। দলও এখন দেবতা। দেবতাকে নৈবেদ্য না দিয়ে সবটাই খেলে হজম হবে কেন। লোকে কি বলল না বল্ল তাতে কিছু এসে যায় না। প্রেসকে সাপ্রেস করা যায় না। কারণ প্রেস তো প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখপত্র। তাছাড়া লোকে তো কিছুদিন বাদে সব ভুলে যায়।

৩২ নং বাঁশ

আমার ঠাকুমা বাসকে বাঁশ বলতো। শ্বশুর বা ভাসুরের নামের সঙ্গে মিল ছিল বলে নয়। তাহলে তো বাসকে ঘাসও বলতে পারতো। আসলে উনি খনা ছিলেন। নাকি সুরে কথা বলতেই অভ্যস্ত। ভাসুরকে বাছুর, স্যারকে ষাঁড়, সুপারিনটেন-ডেনকে সুপুরী ঠনঠন বলতে ওঁর কোন দ্বিধা ছিল না।

* * *

ঠাকুমার ৩২ নং বাস সত্যই যে বাঁশ সেকথা বড় বাজার অঞ্চলে গেলেই মালুম হয়। কলকাতা গোল, লম্বা অথবা ত্রিকোণ কিছু বোঝার উপক্রম থাকেনা। ফুটবোর্ডে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছি। পকেটমার দিব্যি পকেটে হাত চালাচ্ছে। উপায় নেই হাত ছেড়ে ধরার। বললাম সাবধান ভালো হবে না বলছি। তারপর কোন ক্রমে ভেতরে ঢুকে বড় রড ধরে ঝুলতে থাকলুম। একটা ফাঁকা বাসে হলে পনেরো ষোল বছরের কেউ ওভাবে ঝুললে আত্ম হত্যার মত দেখাত।

বললাম—জীবনে দাঁড়াতে চেয়েছিলুম, পারিনি। বাসে বসতে চেয়ে ছিলুম তাও পারলুম না। আমার বয়স অনুমান করে এবং চেহারা দেখে একটি যুবক উঠে দাঁড়িয়ে সিট করে দিল। বলল—দাদু রসিক আছেন তো। একটা সিট ম্যানেজ হল।

* * *

মনে পড়ল স্কুলে শিক্ষকতার সময়ে একটি ক্লাস নাইনের ছাত্রের রচনা লেখার কথা। রচনাটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের ঋতু পর্যায়ের ওপর। লেখাটি নিম্নরূপ—ছয় ঋতু কথাটি অর্থহীন। কাব্যে ও গল্পে চলে। হেমন্ত বসন্ত বাস্তবে অনুপস্থিত। ঋতু-

মাত্র একটি যেমন গ্রীষ্ম! তার দুটি অভিব্যক্তি। একটি শুকনো, অন্যটি ভিজে। চৈত্র থেকে কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত বর্ষা যুক্ত গ্রীষ্ম।

অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন শুকনো গ্রীষ্ম। কারণ বাসে ট্রামে উঠলে ঘাম হবেই। যে ঘামে না সে সম্ভবতঃ মানুষ নয়। পুরুষ তো নয়ই। গায়ে সোয়েটার থাকলে ষ্ট্রোক হবার সম্ভাবনা থাকে।

দুখানা রুমাল না হলে কলকাতায় যাওয়া যায় না। ফেস রুমাল আর বডি রুমাল। বিস্ময়ে অভিভূত হলাম ছেলেটির বাস্তবতাবোধ দেখে।

* * *

ইতিমধ্যে আমাকে সিট ছেড়ে দিতে হয়েছে। ওটা ছিল লেডিস সিট। আমার গলার মাফলারটা ধরে দুজন দুদিক থেকে টান মারছে। চীৎকার করে বললাম—বিনা স্বদেশ প্রেমে আমাকে ক্ষুদিরাম বানাবেন না। তখন আমার সঙ্গে সুবেশ একটি যুবকের পায়ে পায়ে নিঃশব্দ লড়াই চলছিল। উদ্দেশ্য অভিন্ন। একটি সিট দখল করা। এক ভদ্রলোক উঠি উঠি ভাব করছিলেন। কঞ্চি ধরে বেয়ে ওঠা লতার মত যুবকটির পাও আমার পা জড়িয়ে গিয়েছিল। হটাৎ দেখি আমার ধুতির কোঁচায় টান পড়ছে। ছেলেটি আমার কাপড়ে ঘর্মাক্ত মুখ মুছলো। চশমা মুছতে যাচ্ছে।

আমি বললাম—একি হচ্ছে।

উত্তর—স্যারি বুঝতে প্রারিনি। ওটা আপনার ধুতি।

—চোখ নেই।

—আছে। কিন্তু বাসে ধুতি পরে ওঠেন কেন?

—আমি প্রৌঢ় চিরদিন ধুতি পরি। কিন্তু তুমি পরেছ কেন, ইয়ং ছেলে তো।

—বিয়ে বাড়ি যাচ্ছি।

* * *

বড় বাজারের কাজ সেরে বাগবাজারে এলাম। দরকার ছিল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

ষ্টাণ্ড থেকে ওঠার বিরাট সুবিধা। বসে আসা যাবে। দুর্ভাগ্য ক্রমে ষ্ট্যাণ্ডে বাস ছিল না। অগত্যা এদিক ওদিক করে ডানলপ ব্রীজ। হঠাৎ একটা ৩ নম্বরের আবির্ভাব। বসার জায়গাও পেয়ে গেলাম। কিন্তু বিধি বাম। ওটা হ্যাণ্ডিকাপ্টদের সিট। কিছুক্ষণ বাদেই ছেড়ে দিতে হল। আবার ঘাম, আবার ধস্তাধস্তি।

আবার যুদ্ধ। গাড়ি জ্যামে পড়ল মহামিলন মঠের কাছে এসে। প্রচণ্ড গরম। বাতকর্মের দুর্গন্ধ। মনে হল, ওয়াকিং ডিসট্যান্সে যখন এসেই পড়েছি হেঁটে চলে যাই। বোকামো আর কাকে বলে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুদিকে স্তব্ধ লরির মৌন মিছিল। এক জায়গাটা একটু ফাঁক দেখে হঠাৎ নেমে পড়লাম। চোখে ভাল দেখি না। ওখানে স্তূপ করা ছিল পাহাড় প্রমাণ পাঁক। জ্যাম থেকে জেলি। আছড়ে পড়লাম পাঁকে।

কণ্ডাক্টার ছোকরাটি দৌড়ে এসে তুলে ধরলো।

—একি করলেন স্যার। আপনি তো চোখেও ভাল দেখেন না।

—তুমি ?

—মহেন্দ্র স্কুলে আপনার কাছে পড়েছি। উঠিয়ে নিল।

সাদা ধুতি না ছাতার কাপড় বুঝতে পারছিলুম না। গায়ে দুর্গন্ধ। ঘৃণায় পাদানির কাছে দাঁড়াতে গেলাম।

—না না উঠে পড়ুন।

গাড়ি ছাড়ল। দক্ষিণেশ্বরে হাত ধরে নামিয়ে দিয়ে বলল—একটা রিক্সা নিয়ে বাড়ি যান।

—রিক্সাওলা তুলবে আমাকে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ওরা ঘোরে থাকে, পয়সা দিলে কত কি তুলে নেয়।

ষণ্ডা / মোণ্ডা / গুণ্ডা

উপরোক্ত তিনটি জিনিষের একত্র সমাবেশ সম্ভবতঃ কাশী বা বেনারস ব্যতীত অন্যত্র বিরল। কাশীর রাস্তায় রাস্তায় বাবা বিশ্বনাথের বাহন—ষাঁড় গরু। মহাদেব গড, তস্য বাহন ডেপুটি গড। গায়ে হাত দেবার জো নেই। বিহার উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি জায়গায় মিষ্টির দোকানে মণ্ডা, খাজা, মেঠাই এর সমাবেশ বেশি। পশ্চিম বঙ্গের মত ছানার খাবার অর্থাৎ সন্দেশ, রসগোল্লা ওখানে বিশেষ দেখা যায় না। তবে কাশীর ষণ্ডা, মোণ্ডা বিখ্যাত হলেও গুণ্ডার কোয়ালিটি বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গেই ভালো। হাঁ সকলেই চন্দন দস্যু বীরাপ্পান নয়। কেউ ছিচকে, কেউ তোলাবাজ, কেউ ইভটিজার, কেউ হেভিওয়েট। কেউ খুন ধর্ষণ করে, কেউ বা সাইকেল কেড়ে নেয়। উঠতিরা ফ্ল্যাট মালিকের থেকে টাকা নেয়। কেউ স্কুল কলেজের মেয়েদের রাস্তায় বিরক্ত করেই আনন্দ পায়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে গুণ্ডাদেরও শ্রেণী আছে, আছে শ্রেণী সংঘর্ষ। সকলেরই কিছু কিছু বিগ ব্রাদার বা বস আছে। ফলে পুলিশ প্রশাসন অসহায়। কখনো পুলিশ কোলাবরেশনে লুঠতরাজ হয়।

* * *

যে কথা বলছিলাম। শ্যামলী লেখা পড়ায় ভালো। স্নাতকোত্তর। কিন্তু বার দুয়েক এস. এস. সি পরীক্ষা দিয়েও ভাইবাতে সুবিধে করতে পারেনি। তা বাদে ওর লাইন ছিলনা। বাবা মা পার্টি করে না। থাকলে হয়ত শিক্ষকতার চাকরি জুটে যেত। শ্যামলী কালো কিন্তু সুশ্রী। পোষাক সচেতন নয়। যাহোক একটা পরলেই হল। একদিন টকটকে লাল শালোয়ার

কামিজ পরে পড়াতে যাচ্ছিল হঠাৎ চায়ের দোকানের বেঞ্চ থেকে টিটকারী।

—ওরে দেখে যা কয়লার বস্তায় আগুন লেগে গেছে।

শ্যামলী বুঝলো। বাড়িতে এসে মাকে বলল না। মা তাহলে টুশনি যাওয়া বন্ধ করে দেবে। পাড়ার শম্ভুদার ছেলে লম্বু। ঐ রিঙ লিডার। পথে একলা দেখলেই টিপ্পনী কাটে। শ্যামলী ঠিক করলো সন্ধ্যার বদলে সকালে পড়াবে। তাতেও রেহাই নেই। বেকার, বাড়িতে কোন কাজ নেই। চায়ের দোকান, গাছের তলা, মেয়ে স্কুলের পাঁচিল এই সব জায়গাতেই ওদের ঠেক।

* * *

একদিন লম্বুর মা ছেলেকে রাস্তা থেকে এক বালতি জল আনতে বলেছিল।

—বাবাকে বল না কেন।

—বাবার সময় কোথায়, সংসারের জন্যই তো ছুটির দিনেও ওভার টাইম করতে বেরোয়, তুই যা।

লম্বুর পষ্ট উত্তর—আজ খাবার সময় আমার জল লাগবে না।

—এটা কি কোন কথা হল?

—বেশি বাড়া বাড়ি করলে সুইসাইড করবো বলে রাখছি।

কি কথার কি উত্তর। মা ভয়ে আর ওকে ঘাঁটায় না। শম্ভু বাড়ি ফিরলে লম্বুর মা ছেলের নামে অভিযোগ করে।

শম্ভু বলে—বেশি ঘাঁটাবে না। এই তো সেদিন ফিস্ট করতে গিয়ে বোতল খেয়ে জাঙ্গিয়া পরে নাচছিল বলে পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেল। কত কাঠ খড় পুড়িয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম। এখন যদি সুইসাইড করে, তবে পুলিশ মর্গ প্রভৃতি নিয়ে বিরাট

হে'পা। মাসের শেষ আমার হাতে অত পয়সা নেই। চুপ করে থাকবে, ওকে ঘাঁটাবে না।

—বাপ হয়ে তুমি এসব কথা বলতে পারলে ?

—গুণ্ডার আবার বাপ। ছাড়োতো।

* * *

শম্ভুদের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে একদিন শ্যামলী ঘুরে দাড়িয়ে বলল—আচ্ছা, আমাকে একলা পেয়ে কেন তোরা টণ্ট কাটিস। স্কুল কলেজে কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে যায় তাদের পেছনে লাগলেই পারিস। হঠাৎ লম্বু এণ্ড কোম্পানী কিছুটা থতিয়ে যায়। তারপর বলে—আচ্ছা নারী দরদী তো তুমি! শ্যামলী—না তোদের তো মেয়ে দরকার তাই বলছি।

—আচ্ছা ম্যাডাম ঠিক আছে, কিছু মাল ছাড়তো দেখি।

—কত চাই।

—মাত্র দশটাকা, চা খাবো। মস্তি করবো।

—নে।

* * *

তারপর থেকে ওরা শ্যামলীকে দিদি বলে। শ্যামলীও নির্ভয়ে যাতায়াত শুরু করে। অন্য একদিন। শ্যামলী লম্বুকে ডাকে—এই শোন।

—বল দিদিভাই।

—তোরা চেতন বাবুকে চিনিস ?

—আলবত, কেন ?

—আমি ওঁর মেয়েকে পড়াই কিন্তু বেতন দেয় না।

—ছেড়ে দিলেই পার।

—বলিস কিরে ৩ মাসের বেতন বাকি, সামনে পুজো।

—চাওনা কেন ?

—চাই তো। বলে তোমার বউদির জন্য পাঁচখানা শাড়ী

কিনলাম। এবার তো পুজো একদিন বেড়েছে। তাছাড়া ছেলে মেয়েদের জুতো, জামা। একই সঙ্গে আবার বেড কভার, জানলার পর্দা ইত্যাদি। প্লিস কিছু মনে কোরো না। পুজোর পরে সব মিটিয়ে দেবো।

কুৎসিত একটা খিস্তি করে লম্বু বলল—দেখছি কেসটা। একটা কথা পুজোর বোনাস দিতে হবে কিন্তু।

—দেবো।

বলা মাত্রই অ্যাকশন। বাজার যাবার পথে লম্বু চেতনবাবুকে ধরলো।

—বাবা চেতন, ছাড়তো দেখি বেতন।

চেতনবাবু—কিসের বেতন, কার বেতন।

লম্বু—মাল ছাড়তে গেলে লাল সুতো বেরিয়ে যায় না। শ্যামলীকে টুশন ফি দেননা কেন ?

সে তো শ্যামলীর সঙ্গে আমাদের ব্যাপার তোমরা কে ? শ্যামলী শেষ পর্যন্ত গুণ্ডা লাগালো—

—এই চোপ আমরা গুণ্ডা নয়, ষণ্ডা। মাল না ছাড়লে মুখে গুঁজে দেবো মণ্ডা।

এই কথা বলে একটা পেটো দেখাল লম্বু চেতনবাবুকে।

—শ্যামলীকে পাঠিয়ে দিও।

—শ্যামলী আর যাবেনা। আমাদের এ্যাপয়েণ্ট করেছে। এখুনি মাল না ছাড়লে ক্যালাব কিন্তু। আমাদের হাত দিয়েই ক্লিয়ারেন্স হবে। ভয় নেই টাকা মেরে দেবো না।

বেশি কথা না বলে চেতনবাবু তিন মাসের বেতন বাবদ ছ'শ টাকা লম্বুর হাতে তুলে দেয়।

—বাজারে যান ছশ টাকা নিয়ে। অথচ বাড়ির দিদিমনিকে মাইনে দেন না। কেমন ভদ্রলোক আপনি ?

* * *

পরের দিন তীব্র বেগে বাইক চড়ে লম্বু শ্যামলীদের বাড়ির তলায় এসে হাজির। সারসের মত গলা উঁচু করে ডাক দিল—শ্যামলীদি আছেন?

শ্যামলী—এই যে যাচ্ছি—

লম্বু—শিগগির আসুন। মাল ছেড়েছে।

শ্যামলী ফ্ল্যাটের এদিক ওদিক চেয়ে দ্রুত পায়ে নেমে এলো।

—এই নাও তোমার টাকা।

—বলিস কিরে।

—আচ্ছা টাইট দিয়েছি। যাকগে আমার বোনাস দাও।

—দুশো টাকা দিলাম।

—এতো চা বিড়ির খরচ। পুজোর জামা প্যাণ্ট?

—সেতো তোর বাবা দেবে।

—বাবা হাসপাতালে। জামা জুতো দেবার ভয়েই বোধহয় ফুটে যাবে।

—ঠিক আছে, বিপদে পড়লে ডেকো।

শ্যামলী হাসি মুখে ওকে বিদায় দেয়।

*　　　*　　　*

শ্যামলীর মা ওপর থেকে এতক্ষণ সব লক্ষ্য করছিলেন। ঝাঁঝিয়ে উঠে বল্লেন—হ্যাঁরে ঐ বিশববখা ছেলেটার সঙ্গে এতক্ষণ কি কথা বলছিলি? কোনদিন ওকে প্যাণ্ট পরা দেখিনি। লুঙ্গি পরা ছেলেটার সঙ্গে কি এত কথা, কিসের পিরিত?

শ্যামলী—কনফিডেন্সিয়াল। চল বলছি।

লম্বু মানে ঐ ছোকরাটা আগে আমাকে রাস্তায় বেরোলেই জ্বালাতন করতো, তা একদিন সাহস করে ফেস করলুম। আর জ্বালাতন করে না। ও ঠিক মোটা মাপের গুণ্ডা নয়। একটু মিহি ধরনের। ওকে ধরে টুশনির ফুল পেমেণ্ট পেয়ে গেছি।

—ছিঃ। নিজের চেষ্টায় আদায় করতে পারলি না। শেষে গুণ্ডা ধরতে হল। আমি দেখেছি ওকে ছেঁড়া শায়া পরে দোল খেলতে।

—কি করবে বল, বেচারির হয়ত পুরানো প্যাণ্ট নেই। পুজোর মুখে কিছু বকশিশ দিলুম। এলিমেণ্ট খারাপ নয়, আসলে বেকার, কোন গাইডেন্স নেই।

—আর ওবাড়িতে পড়াতে যাসনি।

—না না লম্বুই অফ করে দিয়েছে। তাছাড়া ভালো টুশনির জন্য চেষ্টা করবে বলেছে, তবে হাঁ কমিশন দিতে হবে।

—দিবি। কি বলে ডাকে তোকে।

—দিদি।

—ভাই ফোঁটার দিন না হয় খেতে বলে দিস।

—আমিও ভেবেছি বলবো।

সেই ভালো, সেই ভালো

রবীন্দ্রনাথের গানের একটি কলি। উত্তর পাড়ার কেষ্ট কাকু, এক সময়ে পয়সা ছিল। কেষ্ট কাকু হেসে বলতেন—গাড়ি ঘোড়া ফুলের তোড়া। তিন নিয়ে উত্তর পাড়া। ছেলে ছোকরারা প্রশ্ন করতো—কাকু ময়মন সিং ?

কেষ্টকাকু—যাদের মাথায় জোড়া সিং তাদের কয় ময়মন সিং। জাষ্ট রসিকতা মাত্র। এখন দিন বদল হয়েছে। বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন না। ধার পড়ে যায়। বাড়িওলা ভালো মানুষ। বলেন হাতে পয়সা এলে মিটিয়ে দেবেন। শেয়ার মারকেট বোঝেন। কভি খুস কভি লস। সারাদিন ঘরে থাকেন বিকালে বাড়ির রকে বসেন। বন্ধু বান্ধব বিশেষ নেই। পাড়ার ছেলেদের ডেকে ডেকে কথা বলেন। ডেকে গল্প করা, ডেকে উপদেশ দেয়া ওঁর স্বভাব। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। উনি কিন্তু বলেই চলেন।

তরুণ। পাড়ার একটি ছেলে।

—কিরে তোকে তো আর ফ্যাক্টরী যেতে দেখিনা।

তরুণ—পুজোর মুখে বোনাস দেবার ভয়ে মালিক লট আউট করে দিয়েছে।

কেষ্ট কাকু—ভালোই হয়েছে। যা কষ্ট করে দৌড়াতিস। দিত তো ভারি হাজার টাকা। যা মাঠে ফিরে গিয়ে ক্রিকেট খেলা ক্লাবে টিভি দেখ।

তরুণ তো অবাক। বলে কি। ভীমরতি হয়েছে বোধহয়।

পাশের বাড়ির মেয়ে রীতা। সদ্য বিবাহিতা। শুনেছিলেন কি একটা গোলমালের কথা।

প্রশ্ন করলেন—কিরে রীতা তোকে যেন কেমন দেখাচ্ছে! শাখা সিঁদুর নেই কেন?

রীতা কেঁদে ফেলল। বললো—হঠাৎ ফিল্ট করতে টাটাসুমো উল্টে জামাই মারা গেছে।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোর শাশুড়ী ননদরা তো তোকে অত্যাচার করতো। ল্যাটা চুকে গেছে। এখন তোর পাওনা গণ্ডা নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আয়। একটু সামলে নিয়ে আবার বিয়ে করবি কেমন।

রীতা নিরুত্তর।

অর্থাৎ কারুর চাকরি, কেউ বিধবা হলে কেষ্টকাকু সকলকেই বলতেন ভাল হয়েছে। অদ্ভুত এক চরিত্র।

* * *

দীর্ঘ তিন মাস কেষ্ট কাকুর আর পাত্তা নেই। সকলে ভাবলো হয়ত মরে গেছে। পুজোর ঠিক আগে আবার আবির্ভাব। সেই পরিচিত রকের চৌহদ্দীতে। করুণ—কেষ্ট কাকুকে দেখে সবাই চমকে ওঠে।

—কি ব্যাপার কোথায় ছিলেন এতদিন?

—হসপিটেলে।

—কেন?

—বাস এ্যাকসিডেন্টে একটা পা গেছে। এমপুট করতে হয়েছে।

—তাহলে ভরসা দিলে একটা কথা বলতে পারি?

—বল।

—কারুর চাকরি গেলে, কেউ মরে গেলে সবই তো ভালই বলতেন, এইবার কি বলবেন।

—ভালই তো!

—কি করে?

—এবার পুজোয় একটা জুতো কিনলেই চলে যাবে। খরচ বাঁচলো।

খোকার বাবা ভাজা

ঠাকুমা সেকেলে বুড়ি। শুদ্ধাচারে জীবন যাপন করে। আতপ চাল, সৈন্ধব লবণ, তুলসী পাতা, গঙ্গাজল, একাদশী, অমাবস্যা এসব নিয়েই থাকে। শুধু পুজো আর উপোস। আগে নিত্য গঙ্গাস্নান, বুড়ো শিব আর মুক্তকেশীর পুজো দিতে যেত। এখন পারেনা। বাড়ির কাছে একটা রাস্তার ধারে অশ্বত্থ গাছের তলায় অনেক সিঁদুর চন্দন মাখানো নুড়ি পাথর আছে। ওখানেই সব ঠাকুরের পুজো দেয়। ওখানে শীতলা, মনসা, শিব, কালী সব রকমের দেবতাদের সমন্বয় স্থল। বাড়ির লোকেরাও খুশী। বড় রাস্তায় গেলে অটো বা রিক্সার ধাক্কায় হাড় গোড় ভাঙবে। বাড়ির বৌ ঝিরা এখন শাড়ীর বদলে চুড়িদার পরে, সিঁথিতে সিঁদুর আছে কিনা টর্চ মেরে দেখতে হয়। শাঁখা পরেনা। শুধু কি তাই? স্বামীর নাম ধরে ডাকে।

ম্যাগো। পাপ হবে। এসব কেউ মানতে চায় না।

আমার দাদা ওঁর বড় নাতি। তার বিয়ের জন্য ছোট কাকা মেয়ে দেখতে গিয়েছিল কোন্নগরে।

ঠাকুমা—কেমন দেখলি।

কাকা—হেভি ফর্সা। হিমালয়ের বরফের মত।

ঠাকুমা—হিমালয়ে আবার গেলি কবে? যা দেখিস নি তার কথা দিয়ে তুলনা করবি না।

সামলে নিয়ে কাকা বলল—আচ্ছা বাবা খাঁটি দুধের মত।

ঠাকুমা—খাঁটি দুধ কোথায় রে?

কাকা—ঠিক আছে গুঁড়ো দুধের মত।

ঠাকুমা—তাই বল।

*　　　*　　　*

মাসের শেষের দিকে আমাদের বাড়িতে মাছ হোত না দু একদিন। নানা অজুহাত বৃহস্পতিবার, শনিবার ইত্যাদি। অথচ ভাড়াটেরা রান্না মাছ দিলে বেশ কেমন চুপচাপ প্রায় সকলেই খেয়ে নিত। শেষের কটা দিন খুব কষ্টে যেত। ডালেকে ডাল, ডাল দুকুনে বড়া। গলা থেকে যেন নামতে চায় না। আমি তখন ক্লাশ এইটে পড়ি। ঠাকুমার সঙ্গে ওর এক প্রতিবেশী বান্ধবীর বাড়ি গেছি। ঠাকুমার সই।

সই জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কি রাঁধলে গো সই ?

ঠাকুমা—বোঝোই তো মাসের শেষ কষ্টের সংসার।—তাই ডাল আর খোকার বাবা ভাজা।

—অ্যাঁ বল কি ?

আসলে ঠাকুরদার ডাক নাম পটল আর বাবা ঠাকুমার কাছে সময় সময়েই খোকা।

ঠাকুমা—সোয়ামীর নাম করতে নেই তো।

বান্ধবী—বাবা তাই বল।

বদ্দি = বুদ্ধি

আমাদের এক বৌদি আছেন উনি বৈদ্যবংশ জাত। ওঁর ধারণা পৃথিবীর সর্বত্র যত অভিজাত বাঙ্গালী আছে তার মধ্যে সেনগুপ্ত, দাশগুপ্তরাই প্রধান এবং তাঁরা সকলেই প্রথিত যশা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার সায়েন্সে দিক পাল অথবা বিরাট মাপের অফিসার। বদ্দিদের সাবজেক্ট হল ইংরাজি, অংক, অর্থনীতি, পদার্থ বা রসায়ন বিদ্যা। অর্থাৎ বদ্দি মানেই বুদ্ধি। ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা, সংস্কৃত অর্থাৎ ইংরাজি বাদে অন্য সাহিত্য ও সোসাল সায়েন্স ইত্যাদি বামুন, কায়েত বা শূদ্রদের সাবজেক্ট।

* * *

প্রাতঃকালীন সংবাদ পত্র হাতে নিয়ে চা খেতে খেতে উনি অমর্ত্য সেন, স্বাগতালক্ষ্মী প্রভৃতির নামের তলায় দাগ মারেন। বদ্দিদের বিলেত যাওয়া, আমেরিকায় যাওয়া খুঁজে খুঁজে বার করেন। পাননি একমাত্র চাঁদে যাওয়া। ব্যারিষ্টার ইত্যাদি তো আছেই। কিন্তু ভবানী সেন, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, বিপ্লব দাশগুপ্ত, গুরুদাস দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন সেন তো ওঁর হাতের মুঠোয়। উনি অবশ্যই উচ্চ শিক্ষিতা। আমরাও ছাড়ার পাত্র নই। তাই ওঁর কাগজ পড়া হয়ে গেলে কোথায় কোন বদ্যি চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত কাগজে খুঁজে বেড়াই। মেলে দু একটা। দাগ দিয়ে দেখাই। ওঁর স্পষ্ট জবাব—ওরা বদ্দি নয়। মুসলমান নাম ভাঁড়িয়ে বদ্দি সেজেছে। লাদেন বা সাদ্দামের বাচ্চা।

* * *

ঠিক আছে বাবা। উনি ভাল উদাহরণ দিতে পারেন।

একবার একটি গল্প বল্লেন যার সারাংশ সংক্ষেপে এই রকম।
···একজন মুসলমান ফকির সারাদিন ভিক্ষে করে সামান্য কিছু চাল আর দু একটা আলু সংগ্রহ করেছিল। ভর দুপুর বেলায় গাছের তলায় ইঁট দাঁড় করিয়ে শুকনো কাঠ কুটো দিয়ে অনেক কষ্টে দুটো ভাত ফুটিয়ে খেতে যাচ্ছে এমন সময় গাছের ওপর থেকে একটি কাক তাতে বিষ্ঠা ত্যাগ করে দেয়। হতাশ ফকির মৌলবীর কাছে বিধান নিতে যায়।

মৌলবী বলে—কাকের বিষ্ঠা যুক্ত ভাত না খাওয়াই ভাল। ফেলে দে। ক্ষুধার্ত ফকির বহু বেদনায় যখন ভাত ফেলতে উদ্যত হঠাৎ মৌলবীর প্রশ্ন।

—হাঁরে হিন্দুরা এক্ষেত্রে কি করে ?

—ফেলে দেয় সাব।

—তাই ?

—হাঁ।

—তবে খাগা।

হিন্দুদের বিপরীত আচরণ না করলে আবার মুসলমান কি ?

বৌদির মন্তব্য—হিন্দুরা তো ফেলবেই। কিন্তু বদ্যিরা আবার কারুর পরামর্শের অপেক্ষা করে না। বদ্যিদের ব্রেন ডেন করার জন্য আমেরিকার কি প্রচেষ্টা দেখনা। অমর্ত্য সেন নোবেল জয়ী হবার আগে থেকেই তো ভুবন জয়ী এসব মানো তো ?

—নিশ্চয়।

বৌদির সাবজেক্ট ইতিহাস। তাই প্রশ্ন বললাম আমাদের দেশে যেমন রামমোহন, চীন দেশে তেমনি সানিয়াৎ সেন। দুজনেই বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক। নাম শুনেছেন ?

—নিশ্চয়। সানিয়াৎ সেন চীনের হোন বা জাপানের হোন বদ্যি তো বটে।

বললাম—বৌদি তুমি যুগযুগ জিও।

বৈদ্যনাথ ধর্ষণ

নবকৃষ্ণ। একটি উঠতি যুবক। চেহারায় আর নামে একটু পার্থক্য আছে। কালোকুলো নন্দ দুলাল মার্কা চেহারা নয়। শক্ত পোক্ত শ্যাম চিক্কণ চেহারা। মোচ জোড়া পৌরুষ দীপ্ত। ভাসা ভাসা ডাগর ডাগর চোখ। নাকটা একটু চ্যাপ্টা। ওর দেহের উঠতি যৌবনের লাবণ্যে টকবগে। শমিত ভঞ্জ মার্কা আরণ্যক আদল।

কালী পুজোর প্যান্ডেলে ওর ধুনোচি নাচ দেখার জন্য যে বিশাল সমাবেশ হয় তাতে মেয়েদের পারসেনটেজ সত্তর ভাগ, ছেলেদের ত্রিশভাগ। যেন স্প্রিং। পাড়ার ক্লাবে ছোটরা কাকা বলে ডাকে। কিন্তু টুরে বেরোলে প্রায় সকলেই বোতল খায়। ঐ কটা দিন ছাড়। ও ভালো গান গায়। কিশোরের গান ওর প্রিয়। চুটিয়ে মোস্তি করতে পারে। কিন্তু বোতল খায় না। অন্যায় মনে হলে কাউকে রেয়াত করেনা। পেনালটি হিসাবে অন্যদের বোতলের দাম গুনতে হয়। নির্লোভ। মাথা ঠাণ্ডা। সত্তরের দশকে একবার নকসাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। আবার ক্লাব পলিটিকসেও কখনো মেরেছে। কখনো বা মার খেয়েছে। জেল জরিমানাও গুনেছে।

*　　　　*　　　　*

গরীব বাপ মার একমাত্র সন্তান। ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বাড়ি থেকে ওকে কিছুদিনের জন্য দেওঘরে একটি নিকট আত্মীয়দের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আসলে নির্বাসন।

কিন্তু আত্মীয়রা ভালো। ওর পরিশ্রম করার ক্ষমতা ও সততা দেখে তারা বিমুগ্ধ। কিন্তু দেওঘর তো ভারতবর্ষের বাইরে

নয়। সেখানেও ক্লাব আছে। নকসাল ছেলে তো আছেই। যাইহোক সামলে সুমলে ছিল কটা মাস।

যাই হোক দেওঘরে গিয়ে ও খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ওখানে কি একটা পুজো উপলক্ষে বিরাট প্রদর্শনী ও মেলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মত নানা ধরণের প্রতিযোগিতা হয়। কেরাম খেলাতে নবকৃষ্ণ বারে বারেই বোর্ড জিতে মাত করে দেয়। একবার এটি অদ্ভুত প্রতিযোগিতা হয়। একটি বোর্ডে একটি মেয়ের শুধুমাত্র মুখ আঁকা আছে। মুখের বিভিন্ন স্থানে নাম্বারিং করা আছে। চোখ বাঁধা অবস্থায় ১০নং স্থানে চুমু খেতে হবে। নবকৃষ্ণ প্রথমে দূর থেকে ভালো করে ছবিটি দেখে নিলেও নাম্বারগুলো দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল না। তথাপি··· যথাস্থানে চোখ বাঁধা অবস্থায় সে চুম্বন করে। মেয়েদের ঠোঁটটি যে চুম্বনের উপযুক্ত স্থান তা তার জানা ছিল। ঠোঁটের নাম্বার ছিল ১০। প্রচণ্ড হাততালির মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়। মেয়েরাই এগিয়ে এসে ওর করমর্দন করে। পৌরুষদীপ্ত চেহারার জন্য সর্বত্রই মেয়েরা ওকে জ্বালাতন করতো। ব্রেকডান্স আর কিশোর কুমারের গান করার সুবাদে নবকৃষ্ণ সর্বত্রই জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাজাবে ও দুটো জিনিষ ভালোই খায়।

* * *

পুজোর সময়ে ও বাড়ি থাকতে ভালবাসে। ঠাকুর দেখা, হোটেলে খাওয়ার জন্য নয়। গরীব বাবা মাকে সান্নিধ্য দেবার জন্য। পুজো এসে গেলে মায়ের অনুরোধে ওর বাবা চিঠি লেখে বাড়ি ফিরে আসতে। সঙ্গে লেখেন ও যেন বৈদ্যনাথ ধামে পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে আসে। ওটা ওর মায়ের ইচ্ছা।

আশ্রয়দাতা আত্মীয়দের জিজ্ঞেস করে করে পুজো দিতে যাবে। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিনটা পুজো দেবার কাজে ভালো দিন। যথা আজ্ঞা। কিন্তু খুব ভিড় হয়। একটু ভোরে

বেরোতে হবে। ভোর ৬টায় গিয়ে দেখে পুণ্যার্থীদের বিশাল সমাবেশ। লাইন দিল। পুজো নিল। দেহাতি হিন্দুস্তানী সাধুর দল। নগ্ন দেহ, কৌপিন মাত্র সম্বল। হাতে ত্রিশূল। কণ্ঠে ব্যোম ব্যোম শঙ্কর ধ্বনি। নবকৃষ্ণ সেই ভিড় ঠেলে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছিল। ওর অবস্থা বিধ্বস্ত সাণ্ডুইচের মত। পুজোর উপচার নষ্ট হয়ে গেছে। চোখের সৌখিন চশমা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। পরনের প্যান্টটা অবশ্য যথা স্থানেই ছিল। জামা ছেঁড়া।

দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধামের মন্দির দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ি বা বেলুড় মঠের মত নয়। আলো বাতাসহীন শঙ্কু আকৃতির পাথুরে মন্দির। একটি মাত্র প্রবেশ পথ। ভেতরে ঘোর অন্ধকার। কাঠের ধোয়ায় দম বন্ধকরা পরিবেশ। মন্দিরের এক কোণে সামান্য কিছু প্রদীপের আলো। দেব মাহাত্ম বর্ণনার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা। গর্ভ মন্দিরে প্রবেশের পরে প্রচণ্ড ধাক্কা ধাক্কিতে হঠাৎ নবকৃষ্ণ বেসামাল হয়ে ট্রাকের বাইরে ছিটকে পড়ে। ব্যস আর যায় কোথায়। বলিষ্ঠ চেহারা নিয়ে কি একটা জিনিষের ওপর হোঁচট খায়। লম্বাটে ঐ পিচ্ছিল জিনিষটা জাপটে ধরে। ওর মুখের লালায় চন্দনের গন্ধ। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বুঝতে পারে স্বয়ং বৈদ্যনাথদেবকে লাথি মেরেছে। জড়িয়ে ধরেছে। উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা। বিগ্রহকে নিগ্রহ করায় ও বিশ্বাসী নয়।

কোনক্রমে বাইরে বেরিয়ে আসে। ভাদুরে কুত্তার মত জিভ বের করে মন্দির চত্বরের ফাঁকা জায়গায় বসে দম নিতে থাকে। চায়ের দোকানে গিয়ে চা সিগরেট খায়। বাইরে থেকে একটু পুজো কিনে নিয়ে মাথায় ঠেকায়। ওর আত্মীয়রা বলেছিল ধুতি পরে যেতে। ভাগ্যিস যায় নি। তাহলে পুলিশে ধরতো। ঐ মুহূর্তে ওর দেহে একমাত্র সম্বল বলতে ছিল ঐ প্যান্টটা।

দেওঘর স্টেশনে দেব মাহাত্ম্য জাহির করার জন্য লেখা ছিল 'বি-দেওঘর'। অর্থাৎ বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘর। আস্তানায় ফিরে দুপুরে বাবাকে চিঠি লেখে—বাবা অনেক কষ্টে বৈদ্যনাথকে 'ধর্ষণ' করেছি। হাতের লেখা চমৎকার। কিন্তু ভুলক্রমে দর্শন কথাটির বদলে ধর্ষণ কথাটিই লিখে ফেলে। ওটা ওর মিসটেক। অনিচ্ছাকৃত।

* * *

ক্লাব ওর প্রাণ। ক্লাবে ফিরে বেশ রসিয়ে বলে। আড্ডায় সত্যি কথাটাই বলে ফেলে। যা বাড়িতে বলা যায় না। বলেও নি। শিব লিঙ্গকে লাথি মেরেছি। জড়িয়ে ধরে ও মুখ মিথুন করেছি ইত্যাদি। বন্ধুদের সমবেত মতামত—তোর পা খসে যাবে। ও ভালো ফুটবলার। বলা বাহুল্য ওর পা এখনো অক্ষত আছে। মুখে যতই ফুটানী করুক। মাঝে মাঝে পা তুলে দেখে। না ঠিকই তো আছে।

হাঁ ওর মাণ্টার মশাই ওকে সংস্কৃত পড়াতো। পড়া শুনার জন্য নয়। ওর প্রশস্ত মনের জন্য। সংস্কৃতে ও খুব কাঁচা। উনি বলেছিলেন বিপদে পড়লে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবি। আর দেহ অশুদ্ধ হলে এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করবি।

—স্যার আমরা তো ব্রাহ্মণ নই।

—আরে গায়ত্রী, আচমন ইত্যাদি ব্রাহ্মণদের জন্য নয়, মানুষের জন্য।

—বলুন তাহলে।

—ওঁ বিষ্ণু, তং বিষ্ণু, পরমং পদম্ সদা পশ্যান্তি সুরয় অগ্রে পশ্যান্তি।

—আমি তো অতটা সংস্কৃত মনে রাখতে পারবো না অনুবাদ করে দিনটা বাংলায়।

—ঠিক আছে। স্যার রসিক।

—বাংলায় বলবি কিন্তু হেঁকে হেঁকে হেঁকে বলবি কেমন।

মন্ত্রটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ—ঐ বাঁশ, সেই বাঁশ

পরের নিম্নাঙ্গে সদাই প্রবেশ করাইবে

সরু দিকটি আগে ঢুকাইবে।

বিষ্ণু মানে বাঁশ? স্যার তো সংস্কৃতে ভালো। দেওঘরে যাবার আগেই স্যার ওটা ওকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কারুর জানা নেই বৈদ্যনাথ ধাম থেকে বেরিয়ে ও কথা সে উচ্চারণ করেছিল কিনা। করে থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ তো হিন্দুস্তানী। কে বা ওকে ধরবে। ওর চেহারা দেখে কেউ ওর কাছে এগোবে না এই ছিল রসিক স্যারের আত্ম বিশ্বাস।

ফালতু ঝামেলা

প্রীতমের বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা। দুজনে এক সঙ্গে বেড়াতে যেত। সিনেমা দেখতো। ফুচকা খেত। কোচিং ক্লাশে পড়ার সময় থেকে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা। মেয়েটি রবীন্দ্র সঙ্গীত জানতো। ছেলেটি তবলা বাজাতো। ছেলেটি অঙ্কে ভালো ছিল। প্রিয়াঙ্কা অঙ্ক শেখেনি। কেউ কারুর কথা রাখেনি। তবু বন্ধুত্ব, তবু ঘনিষ্ঠতা। প্রীতম প্যারোডি গান গাইতে পারে।

*　　　*　　　*

শেষ বেশ ওদের বিয়ে হয়নি। প্রীতম বেকার, স্বল্প শিক্ষিত। কাষ্টেও মেলেনি, প্রিয়াঙ্কার অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে। সে সুখী কিনা প্রীতম জানে না। প্রীতম অবশ্যই দুঃখিত। দুঃখটা চাপা। প্রকাশ করেনা। আগে পুজোর সময় দুজনে বেরোত ঠাকুর দেখতে। পুজো মানেই বৃষ্টি। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অষ্টমীর দিনে বেরোনর কথা ছিল। সপ্তমীর দিনে একলাই বেরোল। উদ্দেশ্য ঘুরে বেড়ান, ঠিক ঠাকুর দেখা নয়। ছিঁচ কাঁদুনে বৃষ্টি। ভীষণ অনাসৃষ্টি।

অগত্যা একটি দোকানের শেডের মধ্যে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করলো। সিগারেট ঠিক ছিল। কিন্তু দেশলাইট ভিজে। বন্ধ দোকানের ভেতর কারা যেন চাপা কণ্ঠে কথা বলছিল। প্রীতম গান ধরলো। উদ্দেশ্য গান শুনে দোকান খুলবে। ফলে দেশলাই মিলবে। প্রিয়াঙ্কার প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত হারে-রে-রে-রে। পুরান সেই স্মৃতির স্মরণে প্রীতম প্যারোডি গান ধরলো—

হারে-রে-রে-রে-রে আমায় ছেড়ে দেরে

যেমন ছাড়া রয়েল বেঙ্গল সুন্দর বনে তেরে।

কি আশ্চর্য্য ভেতর থেকে কেউ বেরোল না। দরজা খুললো না। লোডশেডিং চলছিল। দরজার ফুটো দিয়ে ক্ষীণ হ্যারিকেনের আলো দেখা যাচ্ছিল। ভেতরে কে যেন বলছে আগে হাতটা কাট! অন্য একজন মেয়েলি গলায় বলছে—না আগে গলাটা কাট।

এ'কিরে বাবা অসহায় মানুষকে ধরে কারা বোধ হয় খুন করছে।

দরজায় লাথি মারলো প্রীতম সজোরে। নো রেসপন্স। একি কাণ্ড! দৌড়ে রিক্সায় করে পুলিশ ষ্টেশনে গেল। পুলিশ ষ্টেশন কাছেই। হাঁপাতে হাঁপাতে সব বলল। পুলিশ ওকে ভ্যানে তুলে নিল।

—কোথায় খুন হচ্ছে?

—ঐ দোকানের মধ্যে।

—কি করে বুঝলেন।

—ঐ যে হাতটা কাট, গলাটা কাট বলছিল।

পুলিশ ফোর্স দরজায় ধাক্কা দিল। নির্বিকার। কোন শব্দ নেই। টর্চের তীব্র আলোয় দেখার চেষ্টা করলো। তারপর দরজায় লাঠি।

—দরজা খুলুন। নয়ত ভেঙে ঢুকবো। পুলিশ থেকে আসছি আমরা।

তারপর ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল।

—কি ব্যাপার পুলিশ কেন?

—ভেতরে কি করা হচ্ছে?

—দেখুন না।

পুলিশের চোখ ছানা বড়া। একটি প্রৌঢ় একটি মেয়েকে

ব্লাউজ কাটা শেখাচ্ছে। কিভাবে ও জামার হাত বা গলা কাটতে হয় তারই ট্রেনিং চলছে।

*　　　　*　　　　*

এবার প্রীতমের পালা।

—কি ব্যাপার না বুঝে আমাদের হ্যারাস করলেন কেন ?

—কি করে বুঝবো বলুন।

—ইয়ারকি করার জায়গা পাওনি। চল থানায়।

—যা চেচালে। আমার দোষটা কি ?

—চল দেখাচ্ছি।

—ফালতু ঝামেলায় পুলিশ ষ্টেশনে যেতে হবে ?

—ফালতু ঝামেলা পাকালে তো তুমি।

বোটানিক্যাল চচ্চড়ি

কলকাতার বই মেলায় গিয়ে কৌশিক 'সুন্দরবন' নামে একটি রেষ্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকে বলল—দাদা কোবরা চপ দিন তো দেখি ?

দোকানদার—কোবরা মানে গোখরো সাপের চপ ? হয় নাকি ?

—তাহলে রয়েলবেঙ্গল রোষ্ট ?

—না ওসব হবে না।

—তাহলে সুন্দরবন রেষ্টুরেন্ট লিখেছেন কেন ?

—নতুনত্ব নিয়ে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

* * *

পূর্ববঙ্গের ল্যাবড়া অথবা পশ্চিমবঙ্গের ছ্যাঁচড়া দিয়ে পাতলা খিচুড়ী খাওয়া কৌশিকের প্রিয় খাদ্য। অফিস যাবার আগে বাজার যেতে হয়। এক ফাঁকে এক ভাঁড় চা আর একটা সিগারেট টেনে নেয়। ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। ফলে দেরি হয়ে যায়। সাধারণতঃ কিছু লোক ঢ্যাড়স, পুঁইশাক, বিউলীর ডাল আর কুলের অম্বল পছন্দ করে না। কারণ সব কটাই হড়হড়ে। কৌশিক আবার তাড়ার জন্য ঐ গুলোই ভালবাসে। ওর ভাষায়—

দে চকাচক, লে চকাচক। পাঁচ মিনিটে খাবার শেষ। গাঁয়ের ছেলে কার্টসি ম্যানার প্রভৃতির ধার ধারেনা। হোটেলে গিয়ে কাঁটা চামচ ফেলে হাত দিয়ে ফিসফ্রাই খায়।

নব বধূর আপত্তি। দেখছো না অন্য সকলে কিভাবে খাচ্ছে।

—ছাড়োতো। যত সব। নিজের সুবিধে মত খাব। কে কি ভাবলো বয়েই গেল। কৌশিক এ বঙ্গের। বউ ও বঙ্গের। একজন বারাসাতের। অন্যজন বরিশালের। প্রেম করে বিয়ে করেছে। রক্তের গ্রুপিং দেখার অবকাশ ছিলনা। মনের মিলটাই আসল কথা।

কৌশিক ঝাল খেতে পারে না। শাশুড়ীর রান্না ঝালে ভরা। কৌশিকের চোখে জল নাকে সর্দি।

শাশুড়ীর প্রশ্ন—ক্যাঁদস কেনে বাছা।

—না কিছু নয়। আমার মা নেই। ঠাকুমার কোলে মানুষ। আজ ঠাকুমার মৃত্যু দিবস তাই।

—আহারে বাছা, কাঁদে না কাঁদে না, হক্কাল হক্কাল খাইয়া লও। ভাল মন্দ যাই হোক আমারে কইব্যা। শ্যামলী, মানে কৌশিকের বউ জানে ও ঝাল খায় না। মাকে বলতে ভুলে গেছে।

মেয়েরা বাপের বাড়ি এলে সবই বোধ হয় ভুলে যায় বাপ্পানন্দে (বাপের বাড়ির আনন্দে)। নেক্সট্ আইটেম চচ্চড়ি। ক্ষেত খামারে যত রকম সবজি হয় তারই রাসায়নিক সংমিশ্রণ। মন্দ না চচ্চড়িটা।

কৌশিক বলে—বোটানিক্যাল চচ্চড়ি। ডালের মধ্যে সবজি দেয়া উভয় বঙ্গেই প্রচলিত আছে। শ্বশুর বাড়ির ডাল যেন ভাদ্র মাসের বন্যা পীড়িত গঙ্গা। ঐ সময়ে গঙ্গার স্রোতে কচুরী পানা চালা ঘরের কাঠামো, ঠাকুরের কাঠামো, মাদুর, কাপড় চোপড়, ভাড়া করা তক্তাপোষ, মড়ার চালি সবই স্রোতে ভেসে যায়। ডালের মধ্যে নানা ধরণের সবজি প্লাস ভেণ্ডি।

কৌশিক যখন কলেজে পড়ত, ছাত্র মিছিলে সামিল হত। উচ্চৈস্বরে শ্লোগান দিতো—জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও, কালো-হাত গুড়িয়ে দাও। কার বিরুদ্ধে বলা হত এসব এখন আর ওর

মনে নেই। কিন্তু য়ুনিয়ন না করলে তো হাফফ্রিশিপ জুটবেনা। শাশুড়ীর রান্না খেয়ে তো আর শ্লোগান দেয়া চলে না।

তারপর ইলিশ মাছের পাতুরি। সত্যই সুস্বাদু। বাড়িতে এ ধরণের পাতুরি সে কোন দিন খায় নি। লাষ্ট আইটেম বেড়ালের বমির মত এক বাটি পায়েস।

—পরমান্ন খাইয়া লও বাছা।

জিভটা ঝালের চোটে সাপের মত লাফাচ্ছিল। ঠাণ্ডা হল। চোখের জল আর নাকের সিগনী মুছে উঠে পড়ল।

ধারে কাছে কেউ না থাকাতে দড়িতে ঝুলন্ত একটা গামছায় ভড় ভড় করে সিগনী মুছে শ্যামলীকে ইসারায় বলল—বাবা বাথরুম থেকে বেরোলে ভালো করে কেচে দিও। শ্বশুর মশাই এর অনুপস্থিতিতে ওঁর পকেট থেকে একটা সিগারেট ঝেড়ে রাস্তায় গিয়ে প্রেমসে টান দিতে লাগল। ইতিমধ্যে পাইখানার বেগ চেপেছে। বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লুঙ্গি হলদে হবার উপক্রম। ঘামতে ঘামতে গুনগুন করে গাইছে—খোল খোল দ্বার রাখিও না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।

শ্বশুর মশাই বললেন—গানটা তুমি না ছাড়লেই পারতে। তাড়াতাড়ি ফুটবলে লাথি মারার ভঙ্গিতে বুড়োকে হটিয়ে দিয়ে দমাস করে দরজা বন্ধ করে দিল। বুড়োর চোখ গেলেও কান ঠিক ছিল।

শুদ্ধ বাংলা

চিত্তপ্রিয় বাংলা সাহিত্যের ছাত্র নয়। সায়েন্স গ্রাজুয়েট। কিন্তু কালচারে আপাদ মস্তক বাঙালী। মেদিনীপুর বা কাঁথি না বলে কেউ যদি মিডনাপুর ও কণ্টাই বলে তাতে প্রবল আপত্তি জানায়। যথা সম্ভব শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে চেষ্টা করে। ছেঁড়া ন্যাকড়াকে ছিন্ন বস্ত্র, কাঁচা সন্দি'কে তরুণ শ্লেষা, কাঁটাকে কণ্টক বলে। তাই বলে পাঁঠাকে কিন্তু পণ্টক বলে না। চিত্তর কাছে ঘাম স্বেদপ্রস্তুতি এবং কলেরা বিসূচিকা নামেই অভিহিত হয়। ফলে ডাক্তার খানায় গেলে ডাক্তার বাবুরা বিভ্রান্তিতে পড়েন।

* * *

শীতের সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে সচরাচর চা খায়। এহেন চিত্তপ্রিয় একদিন প্রবল শীতে জুতো সোয়েটার পরে বাড়ি ফিরে সোজা বাথরুমে গিয়ে জুতোয় জল ঢালতে সুরু করে দিল।

ওর বউ মায়ার প্রশ্ন—কি ব্যাপার—কি ব্যাপার গোবর মাড়িয়ে এসেছ নাকি?

চিত্তর সংক্ষিপ্ত উত্তর—গোবর নয়, নরবর। অর্থাৎ মানুষের মাল।

* * *

ব্যাচারির একদিন প্রবল জ্বর তার সঙ্গে অন্য দুটি রোগ। ডাক্তার বাবু রবিবারে বসেন না। তাই সোমবারে প্রবল ভীড়। ওর আর ডাক পড়েনা। অবশেষে জোড়ায় জোড়ায় ডাক পড়তে লাগলো। জ্বর ছাড়াও ওর হয়েছিল টনসীল ও হাইড্রোশীল। চলন্তিকা খুঁজেও তাড়াতাড়ি ঐ দুটি রোগের শুদ্ধ বাংলা

আবিষ্কার করার মত সময় হাতে ছিল না। কাজেই চলতি বাংলার আশ্রয় নিতে হল। পাশে অপরিচিত মহিলা।

ডাঃ—কি হয়েছে বলুন ?

চিত্ত—জ্বর, তাছাড়া গলায় শীল এবং তলায় শীল।

ডাঃ—মানে ?

চিত্ত—আমি বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করি না। আপনি বুঝে নিন।

নকল ইউ এন ও

পড়তাম বঙ্গবাসী কলেজে। য়ুনিয়নের প্রেসিডেণ্ট থাকার সুবাদে কলেজে বিতর্ক, সাহিত্য সভা, আলোচনা সভা, গান বাজনার অনুষ্ঠান প্রভৃতি সংগঠিত করার ব্যাপারে কিছুটা ভার প্রাপ্ত ছিলাম। বঙ্গবাসী কলেজের কমন রুম তখন জমজমাট। নানা ধরনের ইনডোর গেমের ব্যবস্থা ছিল। যারা পড়াশুনায় অনাগ্রহী তাদের সমাবেশ হতো অপেক্ষাকৃত বেশি। যে ছাত্ররা বামপন্থী আন্দোলনে হাতে খড়ি দিয়েছিল কলেজে অনুপ্রবেশ করেই তাদের কেউ কেউ পরীক্ষায় বসতো না। পাশ করে গেলেই তো চাকরি যাবে।

আমার বামপন্থী হবার দীক্ষাও ঐ কলেজে। ওয়াল ম্যাগাজিনে লিখতাম। বিতর্ক করা শিখছিলাম। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, গান প্রভৃতিতে দর্শক থাকতাম। বিপ্লব দাশগুপ্ত (বর্তমান সাংসদ), কমলেন্দু ঘোষ আমাদের সঙ্গে ওঠা বসা করত। জুনিয়র ছিল। য়ুনিয়নের সেক্রেটারী অশোক ঘোষ। কাজে দক্ষ, চাল চলনে যেমন স্মার্ট দায়িত্ব জ্ঞানে তেমনি নিপুণ। অপূর্ব বিতর্ক করতো, বাংলায়। একটি মাত্র ইংরাজি শব্দও খরচ না করে। ওয়াই. এম. সিতে, পরিমলবাবু (পদবী মনে নেই), এন বিশ্বনাথনের বিতর্ক শুনতে যেতাম। কলেজ পালিয়ে সিটি কলেজে নারায়ণ গাঙ্গুলীর পড়ান শুনতে যেতাম।

* * *

দেশ ব্যাপী বামপন্থী রাজনীতির উত্থান বা উন্মেষ। কমিউনিস্ট পার্টিতে ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী, রণেন সেন, জলি ও মলি কুস্তলা, ভূপেশ গুপ্ত,

রেণু চক্রবর্তী ও জ্যোতি বসুর তখন স্বর্ণযুগ। সঙ্গীতে সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত, সলিল। সিনেমায় উত্তম সুচিত্রা। সাহিত্যে মানিক বন্দোপাধ্যায়, তারাশংকর, নারায়ণ গাঙ্গুলী আমাদের বেশ কেমন উদ্দীপ্ত করতো। '৫২ সালের ট্রাম আন্দোলন এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে। বনফুলের 'মানদণ্ড' (কমিউনিস্ট বিরোধী বলে) দেখান হচ্ছে 'ছবিঘরে' যাও পিকেট করো। কাউকে দেখতে দেয়া হবে না। ভোরে উঠে কেওড়াতলা শ্মশানে গিয়ে অমুক শহীদের প্রস্তর মূর্ত্তিতে মাল্যদান। সমরেশ বসু, ফাদার ফ্যালো, কালিদাস নাগের আলোচনা সভা সংগঠিত করা হোত কমনরুমে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পি. কে. বসু সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। কলেজ সোসাল সংক্ষিপ্ত করে বন্যার্তদের সাহায্য দানের প্রস্তাব দিলেন। যথা আজ্ঞা, আমরা তাঁর কথাকে শিরোধার্য করে নিলাম। এ. আই. এস. এফ এর সেক্রেটারী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় বিভিন্ন মিটিং, মিছিল আন্দোলনে সামিল হতে হত। স্টুডেন্ট ফেডারেশনকে এক সময়ে স্টুডেন্ট বদারেশন মনে হত। নিরুপায়। জড়িয়ে পড়েছি। পড়াশুনার বারোটা বাজলো ইউনিয়নের নির্বাচনের জন্য রাত জেগে কলেজের দেয়ালে ওয়ালিং করার মধ্যে কখনই থাকতাম না। রাত্রে বাড়ির বাইরে থাকার কথা ভাবতেই পারতাম না।

* * *

যা বলছিলাম, একবার কলেজ কমনরুমে নকল ইউ. এন. ওর আয়োজন করা হয়েছিল। ইসুটা মনে নেই। একদিকে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স অন্যদিকে রাশিয়া চীন সহ সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর প্রতিনিধিরা। নিত্যই মহড়া! প্রত্যেক আসনের সামনে লাল কালিতে কে কোন দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে লেখা ছিল। আমাকে বৃটেনের প্রতিনিধি সাজানো হল। বিষয়টা আমার কাছে খুব একটা পরিস্কার ছিল না। বলা হল ভোট

হলে আমেরিকার পক্ষে হাত তুলতে হবে। কারণ আমরা এ্যাংলো আমেরিকার ব্লকের সদস্য। তারাই মেজরিটি। কাজেই জয় অনিবার্য্য। ভোট হবে একটু পরে। অন্যমনস্ক ছিলাম। হঠাৎ দেখি আমেরিকার প্রতিনিধি হাত তুলছে। বোকার মত পক্ষে হাত তুললাম। সকলে অবাক। রাশিয়ার প্রতিনিধি (সম্ভবতঃ ভিসিনিস্কি) সহাস্যে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—বৃটেনের অনারেবল প্রতিনিধি এটা ভোট নয়। উনি আসলে বগল চুলকাচ্ছেন। ভাল করে দেখুন। এভাবে নিজের দেশ বৃটেনকে আপনি ডোবাবেন না। বগল চুলকানর জন্য একটি হাত উঁচু করে অন্যটির সাহায্য নিচ্ছিলেন। ভিড়ের চাপে আমি দ্বিতীয় হাতটি দেখতে পাইনি। প্রিন্সিপ্যাল পি. কে. বোস সহ সভার সকলের প্রবল হাস্যধ্বনির মধ্যে সভা কার্যতঃ পণ্ড হবার উপক্রম হল।

Ink-কালি

বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অধ্যাপক কালি মুখার্জী। ইংরাজীর অধ্যাপক, অন্যজন অঙ্কের অধ্যাপক। তিনিও কালি মুখার্জী। ছাত্ররা গোলমাল এড়ানর জন্য বলতো—ইংকালী, অংকালী। রাশভারী অধ্যক্ষ। ঐ কলেজের নিয়ম অনুযায়ী অধ্যক্ষকে ক্রিশ্চিয়ান হতে হবে। ঠিক বাংলা বোঝেন না। ছাত্ররা কায়দা করে বুঝিয়ে দিলে উনি মৃদু হাসেন। ঐ কলেজের দুজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিল। দুজনে আপন ভাই। সজনী দত্ত ও নজনী দত্ত। ছাত্ররা ওদের ক্ষ্যাপানর জন্য বলতো—সজনে ডাঁটা ও নাজনে ডাঁটা। কলেজের ৩য় বর্ষের ছাত্রের কাছে প্রিন্সিপ্যালের প্রশ্ন—What do you mean by ড্যাঁইটা? —Yes Sir, green stick, ঠিক আছে। কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে সরস্বতী পুজোয় কলেজ অথরিটির আপত্তি। কিন্তু রবীন্দ্র জয়ন্তী করায় সম্মতি ছিল।

ছাত্ররা অনেক করেও বোঝাতে পারেনি অধ্যক্ষকে সরস্বতীর দরবারে যিশু নামমাত্র শিশু। ইংরাজী অনার্সের একটি ভালো ছাত্র। নাম হরি পালিত। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে রজনীগন্ধা মাস্ট, কিন্তু বাজারে মেলেনি। ছাত্ররা তাই কবির প্রতিকৃতিকে জবা আর ধুতরো ফুল দিয়ে সাজিয়ে ছিল। প্রিন্সিপ্যাল হরি পালিতকে ডেকে বল্লেন—হ্যারি পলিট—What kind of flower is this?

হরির তাৎক্ষনিক উত্তর—Baba flower (I mean ধুতরো, শিবের ফুল), Ma flewer means জবা, Black godess অর্থাৎ কালির ফুল।

—I see very good.

হরি আবার কানে কম শোনে। ভেলি গড় বলে কেনরে বাবা ?

আবৃত্তি অনুষ্ঠানে বীরেন দাস নামে জনৈক ছাত্র রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' থেকে বলতে শুরু করলে "ফিরানু তাদের বাহির দ্বারে।" বিদেশী অধ্যাপক অ্যালেন ডেভিড পরে ছাত্রটিকে প্রশ্ন করে—What do you mean by বাহির দ্বার ?

উত্তর—Out door Sir, out door। ছাত্রটির নাম বীরেন দাস। বিদেশী অধ্যাপক ওকে বায়রণ ডাস্ট বলে ডাকতেন। বাংলা ভাষা শেখার জন্য ওঁর দারুণ আগ্রহ। রাস্তার মড়া নিয়ে যেতে হরিবোল দেয়। কলেজে এসে উনি হরিবোলের মানে জিজ্ঞেস করেন। ছাত্রদের ঝটিতি উত্তর

—Horrible Sir Horrible.

—বলিহারি, very bad Sound.

—Silently যেতে পারেন না।

—Retural Sir Retural,

Special English ক্লাশে অধ্যাপক কেলার প্রশ্ন করলেন ছাত্ররা একদম গ্রামার বোঝে না। উনি degree পড়াতে চেষ্টা করেন।

—Good, better, best.

ছাত্ররা আবার হৈ হৈ সুরু করলে উনি হরির শরণাপন্ন হন। হরি ডাটের মাথায় বোর্ডের কাছে এসে বলে উঠল—তোরা হলি অধম, আমি অধমাধম, আর স্যার অধমাধম ধমাধম। হলে প্রবল হাস্যধ্বনি—স্যার আপনি পড়িয়ে যান। বাঙ্গালীর বাচ্চা, কভি নেহি সাচ্চা।

*   *   *

ইংরাজির ক্লাশে অধ্যাপক কেলার সেক্সপীয়র পড়াতেন।

ভীষণ রাশ ভারি মানুষ। টেবিলে বই খোলা না দেখলে ভীষণ রেগে যেতেন। একদিন পাকড়াও করেছেন এক ছাত্রকে—Where is your book ?

—বই নেই স্যার।

—Then copy a book.

—কপি করার হিম্মৎ নেই স্যার, মানে শক্তি নেই।

—Then Purchase a book

—Purchasing capacity নেই স্যার।

—Then steal a book.

—Thank you Sir.

উত্তেজিত কেলার সাহেব টেবিলে নিজের বইটি ফেলে দৌড়ে চলে যান।

*　　　*　　　*

পরের দিনে ধীর গতিতে অধ্যাপক কেলারের ক্লাশে অনুপ্রবেশ। বাঘের মত মুখ করে মৃদুমন্দ হাসি। মঞ্চে উঠে শ্লোগান বদলে সুরু করলেন। বই না—থাকলে—

—Purchase a book

—Copy a book

—If not steal a book

—Except my book.

সহাস্যে চেয়ে ছাত্রটি টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বইটি ফেরত দিল। স্যার হ্যাণ্ডসেক করলেন। ছাত্রদের সমবেত ধ্বনি ওঁ শান্তি।

*　　　*　　　*

যে কালি প্রসঙ্গে গল্পের অবতারণা সেই ইংকালি ছাত্রদের কাছে ক্রমশঃ ink কালিতে পরিণত হল।

টেষ্ট পরীক্ষা

বকুলেরা পাঁচ ভাই, এক বোন। দিদির অবস্থা ভাল নয়। জামাইবাবুর আয় সামান্য। বাচ্চাকাচ্চা সাড়ে পাঁচটি। দিদি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। অন্য বারে হলে ভাই ফোঁটা দিতে আসে। বাবা ও ভাইয়েরা মিলে মাছ মাংস মিষ্টি কিনে দেয়। দিদি সামান্য কিছু খরচ করে। তখন ঠিক আজকের দিনের মত ভাইয়েদের উপহার দেবার চল ছিল না। সেবার দিদি চিঠিতেই নিমন্ত্রণ সারলো। জানাল সকলে যেন আসে। অনুমান চার ভাই সাপ্তাহিক দিনে চাকরি কামাই করে আসবে না। বকুল বেকার বলে ঐ আসবে।

*　　　*　　　*

অনুমান সঠিক। পাঁচজনে দল বেঁধে এলে অনুমান হনুমানে পর্য্যবসিত হলে সবাই দল বেঁধে এসে হাজির হত। বকুল এলো একটা শাড়ি ও কিছু টাকা নিয়ে। বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। বকুল ভাই ফোঁটাকে ব্রাদার ড্রপিং বলতো। স্যাঁতসেঁতে বাড়ি ঘর। এক গাদা বাচ্চাকাচ্চা। পাশে জড়ো করা ছেঁড়া কাঁথায় মুতের গন্ধ। কেমন যেন ঘিন ঘিনে পরিবেশ। মিষ্টি খাবার পর চা এলো।

বকুল দেখলো একটা সাদা ইঁদুর চৌকির তলা থেকে পালিয়ে গিয়ে বাক্সর তলায় ঢুকলো। ছোট ভাগ্নে টুকাই বকুলের কানে কানে বলল—ইঁদুরটা দুধে পড়ে গিয়েছিল।

ঐ দুধে চা। বাপরে, বকুলের গা তোলপাড় করে উঠলো। দিদিকে কিছু না বলে এক ফাঁকে বাইরে গিয়ে পান সিগারেট খেয়ে এলো। গা বমির ভাবটা কেটে গেল। বিকালে বাড়ি যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ। দিদি

বললো– না আজ বাড়ি যাওয়া হবে না। আসিস না তো। রাত্রে জামাইবাবুর সঙ্গে গল্প করবি আজ থেকে যা।

—শোব কোথায় ? তোমার তো একখানা ঘর।

—তোর জন্য ভালো ব্যবস্থা আছে। অন্য একটা ফাঁকা ঘর আছে। একলা শুতে পারবি তো।

—অসুবিধে নেই। ঘরটা সদ্য চুনকাম করা বেশ পরিষ্কার। অগত্যা "একটু ঘুরে আসি" বলে বকুল বেরিয়ে পড়ল। দিদির বাড়ির পাশে সিনেমা হল। চলছিল 'দিল তেরে দেওয়ানে'। ঢুকে পড়ে সিনেমা দেখলো।

—এত রাত কেন ? কোথায় গিয়েছিলি।

—সিনেমা দেখে এলুম।

—যা মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে খেতে বস।

জামাইবাবুও বসলেন। মন্দ না। গরম লুচি, বেগুনভাজা, ডিমের তরকারি, মিষ্টি, খেয়ে ভালোই লাগলো। গরীব হলেও তো মানুষের সখ থাকে। বেচারা দিদি। একটু গল্প গাছার পরে জামাইবাবুর সঙ্গে তাস খেললো। দিদি ওকে একটা জামার পিসও দিয়েছে।

* * *

তারপর শোবার পালা। দিদি চাবি খুলে দিল। সত্যিই ভালো ঘর।

বকুল—এমন সুন্দর ঘরটাকে ফেলে রাখ কেন ? এক ঘরে ঠাসাঠাসি করে থাকতে ভালো লাগে ?

দিদি—লোক কুটুম এলে এ ঘরে থাকতে দিই। যা রাত হয়েছে, শুগে যা। জলের গ্লাস ও হাত পাখা দিল। দিদির বাড়িতে পাখা নেই।

তাছাড়া পুজোর পরে সেবার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব ছিল।

দিদি—দেখ ঘরে জানলা নেই বেশি। মাথার কাছের

জানলাটা খ্বলে রাখিস। হ্যাঁ অস্ববিধে হলে ডাকিস কেমন।

বকুল—কিসের অস্ববিধে? তুমি যাও।

সারাদিন খাটাখাটনি করেছ শ্বয়ে পড়।

বকুল যথারীতি মাথার জানলা খ্বলেই রাখলো। একটু বাতাস রাখার জন্য।

* * *

বকুল প্রেমসে একটা সিগারেট টেনে শ্বয়ে পড়ল। আধঘণ্টা কেটে গেল। সবে ঘ্বম এসেছে। দিদির ডাক জানলা দিয়ে।

—বকুল?

—কেন।

—কিছ্ব অস্ববিধে হচ্ছে নাতো?

—না, তুমি শ্বয়ে পড়।

—আবার ডাক। নানা অজ্বহাতে। জল, পাখা, চাদর। মনে হল দিদি যেন বারবার জানলা দিয়ে উঁকি মারছে। শেষে জানলা বন্ধ করে দিল।

গভীর ঘ্বমে রাত কাবার।

* * *

সাত সকালে দিদি এসে দরজায় ধাক্কা মারছে।

বকুল। ও বকুল।

—কেন?

—উঠে পড় চা হয়েছে।

চা খেতে খেতে বকুল বলল—বারবার ডাকছিলে কেন?

দিদি—বলছি।

—জানিস ঐ ঘরে আমার ছোট দেওর গলায় দড়ি দিয়েছিল। তারপর থেকে ভয়ে ওঘরে কেউ শোয় না। তুই তো ভ্বতে বিশ্বাস করিস না। তাই তোকে গিয়ে টেস্ট করিয়ে নিল্বম। ভয় পাসনি তো?

বকুল বিস্ময়ে হতবাক। দিদিকে কিছু না বলেই বাড়ি ফিরে এলো। বাড়িতে ফিরে মাকে সব বললো।

মা তো রেগে লাল। ছিঃ নিজের ভাইকে দিয়ে গা সওয়া করে নিল।

আচ্ছা মেয়ে তো স্বপ্না। আসুক দেখছি।

আর কখনো ওদিকে যাবি না।

অনন্ত জিজ্ঞাসা

বিকাশের শিশু পুত্র বিমান। বিকাশ সরকারী চাকুরে। দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত। ছেলে বৌকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাবে তার উপায় নেই। যাবেই বা কোথায়। চারিদিকে আতঙ্ক-বাদের ঘাঁটি। নৌকায় চড়ে না। বৌ সাঁতার জানে না বলে তার ভয়। ট্রেনে চড়ে না, জঙ্গীরা কোথায় ফিসপ্লেট খুলে রাখবে। সপরিবারে মরবে। শ্বশুর বাড়ি যায় না রাস্তায় জ্যাম বলে। বিকাশেরা আট ভাই বোন। কেউ কারুর খোঁজ রাখে না। উৎসবে বিপদে অবশ্য একত্র হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম বিয়ের পর পুরী যাওয়া। বিকাশ সমুদ্রে ওর বউ কলে স্নান করেছে। ঐ যে সাঁতার জানে না। জানলেই বা কি? পুরীর সমুদ্রে আবার সাঁতার। বাসায় ফিরে দেখে সব চুরি হয়ে গেছে। টিকিট কাটার পয়সাটুকু সম্বল করে শেষে কোনমতে বাড়ি ফেরে। হনিমুন শেষে হনুমানের মত অবস্থা।

*　　　　*　　　　*

সেদিন ছিল শনিবার ছুটির দিন। শিব রাত্রির দিন সুমনার উপোষ। পাড়ায় বারোয়ারী তলায় বিশাল এক মহাদেবের মূর্তি করে ক্লাবের ছেলেরা পুজো করছে ঢাক ঢোল বাজিয়ে। ওরা সব ধরনের পুজো করে। ওরা বেকার। চারটি লোহা জোগাড় করে ম্যায় বিশ্বকর্মা পুজা অব্দি। কালি পুজো তো মাস্ট। বিমানের অনন্ত জিজ্ঞাসা। দিনের বেলায় শিবরাত্রি হয় কেন? চাঁদ রাতে ওঠে কেন? দাদুর গোঁফ নেই কেন, অটো চালকের পাশে মেয়েরা বসে কেন? বিকাশ সাধ্যমত উত্তর দেয়, আর বিরক্তবোধ করে। অন্য দিনে ওর মা কি করে সামলায় কে জানে।

*　　　　*　　　　*

মেলা তলায় গিয়ে শিবের জটা ভেদ করে গঙ্গার উত্থান দেখে প্রশ্ন করে বাপি শিব মাথা দিয়ে পেচ্ছাব করে কেন? বিরক্ত হয়ে বিকাশ বলে ওঁর তলার দিকে গোলমাল আছে।

—নালি কেটে দিতে পারে তো ডাক্তাররা?

—শিব অপারেশন করাতে ভয় পায়।

শিশু ভোলানাথের প্রশ্ন শুনে গার্ডেন চেয়ারে বসা উঠতি যুবকের দল হো হো করে হেসে উঠল—বাপিকে আরো প্রশ্ন করো। জিও বেটা জিও।

*　　　　*　　　　*

দুর্গা পুজোর সময়ে আবার একই ধরনের সমস্যা। ছেলেকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে উল্টো পাল্টা কিছু প্রশ্ন করবে না।

ফুচকা খাও, আইসক্রীম খাও, বেলুন ওড়াও ঠিক আছে। সব পাবে। ছেলে বাধ্য ভাবে মাথা নাড়ে। কিন্তু চলা পা আর বলা মুখকে কে ঠেকাবে। ছেলে উসখুস করছে।

মা সুমনা জিজ্ঞেস করে কিছু খাবে, পেচ্ছাব পেয়েছে, পায়ে ফোস্কা উঠেছে?

—না।

—তবে?

—একলা পেয়ে দুর্গা ছেলে মেয়ে নিয়ে অসুরকে মারছে কেন? অসুরের কোন বন্ধু নেই। বিকাশের প্রশ্ন সত্যই তো। অসম যুদ্ধে অসুরকে এভাবে নিধন করা কেন? দেবী দুর্গা তো অন্যায় যুদ্ধেই জিতেছেন।

*　　　　*　　　　*

রামায়ন মহাভারতের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের নগ্ন স্নানের সুযোগ নিয়ে কদম গাছে উঠে পড়ে। ইতিহাসের সিরাজের মত। শ্রীকৃষ্ণের কি লণ্ড্রীর ব্যবসা ছিল? নাকি নেহাতই

অসভ্যতা। প্রকাশ্য সভায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করলো। নিশ্চয় মদ খেয়েছিল। কিন্তু বাকি ভাইরা ভীষ্ম, দ্রোণ, শ্রীকৃষ্ণ এরা চুপ করে রইলেন কেন। দ্রুপদ রাজা বোম্বাই কটন মিলের মালিক হলে মেয়েকে না হয় শ খানেক শাড়ি পরিয়ে রাখতেন। বর্তমানের ইভটিজাররা তো শুধুই টন্ট করে। এতটা সাহস তো দেখায় না। নিজের মামী রাধাকে (ইছাই ঘোষের বউ) পথে একলা পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ কি কেলেঙ্কারীটা না করেছে।

মানুষের বেলায় বেলা, কৃষ্ণের বেলায় লীলা। বাঃ।

ইন্দ্রজিৎ আণ্ডার গ্রাউণ্ডে আণ্ডার প্যাণ্ট করে যজ্ঞ করছিলেন। উপাস্য ত্বিষাম্পতি দেব (সূর্য বা আগুনের দেবতা)। সঙ্গে ফল মূল ও ফুল। একে ফরটিসেভেন, সিক্স চেম্বার, পেটো পাইপ গানের প্রশ্নই ছিল না। এদিকে কাকা বিভীষণ জার্সি বদল করে, হেভি নোট খেয়ে রামের টিমে জয়েন করেছে। লঙ্কাপুরীর গোপন চেম্বারটা তার জানা ছিল। পুজো শেষ হলে তাকে কেউ মারতে পারবে না। তাই পুজোর মধ্যেই ঝোঁপ বুঝে কোপ মারার হাই টাইম। বক্সিং লড়তে গিয়ে তলপেটে ঘুসি মারলে ফাউল হয়। অথচ নিরস্ত্র বীর ইন্দ্রজিৎকে এ্যাণ্টি চেম্বার থেকে আর্মস্ আনতে দেয়া হল না প্রচুর রিকোয়েস্ট সত্ত্বেও। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। আমেরিকার সাদ্দামকে পেটানোর মত কেস। আমরা কেমন রামধুন গাই। কৃষ্ণ কীর্তন করি। সাধে কি মধুসূদন লিখেছিলেন—

I hate Ram and his rabble, I love রাবণঃ। সীতার মত বেয়াকুব কেউ আছে। বনে গেছ। সাধুর মত জীবন যাপন করবে। অত সোনার লোভ কেন—"আমার সোনার হরিণ চাই, তোরা যে যা বলিস ভাই" বলে টুইস্ট দিতে লাগলেন। রাম জঙ্গলে দৌড়লেন বোকার মত। রামের চিৎকার শুনে ভাই লক্ষ্মণ

তাঁকে ফলো করলেন। রাবণ হিরো হোণ্ডা (সারি রথ) নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। চান্স কেউ মিস করে। তুলে নিয়ে গেল।

অল্প সময়ের মধ্যেই—কাম সারসে।

আবার দেখো সমুদ্র মন্থনের কেসটা। দেবতারা সমুদ্র মন্থন করে অমৃত খাবার লোভটা সামলাতে পারল না। ডাক পড়লো অসুরদের। এতবড় দড়ি কোথায় পাওয়া যাবে। সর্প-রাজ বাসুকীর ডাক পড়লো। দেবতারা ল্যাজ ধরলেন।

অসুরদের মুখ ধরতে বলা হল। এতো আর লস্যি বানান নয়। বাঁকুড়ার পাথুরে মাটিতে টিউবওয়েল বসানর মত ব্যাপার। দুদলের টাগ অফ ওয়ারের ফলে লক্ষ্মী দেবী অমৃত ভাণ্ডার নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। আবার বাসুকীর মুখ দিয়ে বিষও বেরিয়ে এলো। দেবতা, দানব, বিষ অমৃত, জীবন মৃত্যু।

দেবতারা এমন বেইমান অমৃতের হাঁড়ি নিয়ে পালাল। দিয়ে যা। অন্ততঃ ফিপটি ফিপটি কর। তা না করে দে দৌড়। অসুররা মহাদেবের কাছে ডেপুটেশন দিল। মহাদেব বেয়াকুব বনে গেলেন। ওঁকে সামনে রেখেই লুটপাট। শেষে উনি হলাহল পান করে অসুরদের গার্ড করলেন। বোনাস যাক, অন্ততঃ চাকরিটা থাক এই ধরনের একটা মীমাংসা হল। উনি নীলকণ্ঠ হলেন। দেবতারাও 'এটেম্‌ট টু মার্ডার কেস' থেকে বাঁচলেন!

*   *   *

আবার ছেলের প্রশ্ন—বাপি মহাদেব বাঘছাল পরে কেন লুঙ্গি নেই?

*   *   *

সত্যিই তো মর্তে বাঘ মারা নিষেধ। স্বর্গেও হয়ত একই নিয়ম। বন্য প্রাণী সংরক্ষণ। গল্প আছে না একবার পুজো মার্কেটিং করতে গিয়ে কার্তিক সব কিছু এনেছে। আর্নেনি

শুধু মায়ের শাড়ী, দুর্গার মুখ ভার। বাপের আণ্ডারপ্যাণ্ট এলো অথচ আমার জন্য একটা শাড়ী পর্যন্ত এলোনা। কার্তিক বললে বন বিভাগ এখনও অচেতন। কোন দিন বাঘ ছালটা খুলে নেবে কোমর থেকে তখন ফ্যামিলী প্রেস্টিজ পাংচার। সেকেণ্ড রাউণ্ডে তোমার শাড়ী আনবো ঘাবড়াও মাত। দেবতারা বদমায়িসও বটে বোকাও বটে। ভগবান কান দিয়েছে শোনার জন্য মানুষ কান দিয়ে শোনে। আবার কানের ওপরে চশমার ডাঁটি লাগায়। দেবতাদের বিশেষ করে দুর্গা, কালী, মহাদেবের তিন চোখ। চোখ খারাপ হলে বেলপাতার মত চশমা লাগবে। খরচও বেশি। মানুষের দু চোখ চশমার খরচ কম। মহাদেবের অনেক বউ—কালী, দুর্গা, গঙ্গা, সতী ইত্যাদি। মানুষের এক বউ। কাজেই একটা ফ্রিজ, একটা টিভি, একটা ফ্ল্যাট নিলেই চলে যায়। দেবতাদের কি করে চলে কে জানে। দেবতাদের অনেক বাচ্চা—(ফ্যামিলি প্ল্যানিং বলে কিছু নেই। মানুষের গড়ে দুটি হামদো, হামারাদো)। সীতার পাতাল প্রবেশের কেসটাই ধরুন না। একালে সম্ভব ছিল না। সর্বত্র ফ্ল্যাট বাড়ি। মাটি নেই। পুকুর নেই। আছে শুধু কুড়ি টাকা লিটারের কেরোসিন, ইঁদুর মারা ওষুধ আর সিলিং ফ্যান। মাটির তলায় জলের পাইপ অথবা সহর অঞ্চলে টিউব রেলেরার ইন। রাবণের বাগান বাড়িতে সীতাকে কিছুদিন আটকে রাখা হয়েছিল। হনুমান গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে হাত মুখ পুড়িয়ে এসেছে। এখনকার মত মেডিকিওর বা হেল্প লাইন ছিল না। রামচন্দ্র তো ক্ষেপে বোম। রামচন্দ্র রাবণ বধ করে সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ব্যাক করলে হাটে বাজারে প্রজারা সীতার নামে কুৎসা রটনা করতে থাকে। রামচন্দ্র কান পাতলা ছিলেন। তুমি রাজা ও দেবতা, ডিসিসান নিতে পার না। এ কেমন কথা। উনি বললেন—সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে আবার। সীতার ভ্যানিটিতে লাগলো।

বারবার কনসাল্ট করে ইনসাল্ট করার কোন মানেই হয় না। শেষ পর্যন্ত রাগের মাথায় গর্তে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। এর নাম সীতার পাতাল প্রবেশ। রামচন্দ্র ভগবান এবং রাজা। সুইসাইড নোট কিছু ছিল না। পুলিশ প্রশাসন ওঁরই হাতে। সব ধামাচাপা পড়ে গেল।

* * *

বিমানের মত বিকাশেরও সমস্ত জিজ্ঞাসা। শত্রু পক্ষের শক্তিসেলের ধাক্কায় লক্ষ্মণ কাত। ইনসেনটিভ কেয়ারে রাখার কেস। দেব বৈদ্যরা প্রেসক্রিসশন করলেন হিমালয় থেকে বিশল্যকরণী ও মৃত সঞ্জীবনী গাছের পাতা এনে রাত্রের মধ্যেই খাওয়াতে হবে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় হাতে। পরের দিন অব্দি ওয়েট করা যাবে না। হনুমানকে দায়িত্ব দেয়া হল। একে পাহাড় তায় রাত। হনুমান ওষুধ খুঁজে পেল না। এখনকার দিন তো নয়। শ্যামবাজারের দেজ মেডিকেলে না পেলে ধর্মতলায় ফ্রাঙ্করসে পাওয়া যাবে। কিন্তু হনুমানের কোন বিকল্প ছিল না। তাছাড়া প্রেসক্রিপশনও বোধ হয় হারিয়ে ফেলে ছিল। হনুমান গোটা হিমালয় পাহাড়টাকে কাঁধে তুলবে ঠিক করলো। রামের আশীর্বাদে সবই সম্ভব। আমাদের মত পাঁচ কিলো গম ভাঙালে রিকসা চড়তে হয় না।

* * *

কিন্তু সর্বনাশ সূর্য্য উঠছে যে।

হনুমান এগিয়ে গিয়ে সূর্য্যকে সুধালো—তোমার নাম কি ভাই ?

সূর্য্য—ভানু।

আমার নাম—হনু।

এসো আমরা হাত লাট্টু খেলি। সূর্য্য সরল বিশ্বাসে এগিয়ে এলে হনুমান ওকে বগলে পুরল। একে হনুমান তায় বগল।

এখনকার মত তখন তো বগলের রোম ধ্বংস করার ওষুধ ওঠেনি। ঘামের দুর্গন্ধে, সূর্য্য অজ্ঞান হয়ে গেল। ঘাম আর লোম। সোজা কথা। হনুমানের পক্ষে দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব ছিলনা। সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের সেই বিখ্যাত কবিতা।

—রানার রানার ভোর তো হয়েছে, আকাশ হয়েছে লাল। ওসবের তোয়াক্কা না করে হনুমানের কাঁধে হিমালয় আর বগলে সূর্য্যদেব। এইভাবেই রামের মিলিটারী কাম্পে প্রবেশ। ওষুধ পড়ল। লক্ষ্মণের সেন্স ফিরছে। রামের হাতে ঘড়ি নেই। ঘড়ি তখন ওঠেনি। তবু অনুমানে বললেন—এখনো ভোর হচ্ছে না কেন ?

হনুমান—সূর্য্য আমার বগলে।

রাম—শিগগির ছেড়ে দে।

ছাড়া পেয়ে সূর্য্যদেব বমি করলো। উঠতি যুবকেরা সত্তর টাকা দামের বোতল খেয়ে প্রথমে যেমন বমি করে। সূর্য্যও দেবতা। হনুমানের নামে এফ. আই, আর করতে পারতেন। রাম হয়তো রিকোয়েষ্ট করেছিলেন।

* * *

যাকগে মরুক গে। দেবতাদের ক্ষেত্রে যা লীলা, মানুষের ক্ষেত্রে তা রেলা। বিমান ঘুমিয়ে পড়েছে। বিকাশের ভালো পাঞ্জাবীটা ভিজে ভিজে লাগছে।

—দেখলে তো মুতে দিয়েছে। বলেছিলাম ভাল পোষাক পরব না।

স্ত্রীর উত্তর—রাগ করো না। বাচ্চাদের মুতে দোষ নেই।

—গঙ্গাজল না !

—আরে চলতো। রাত হয়ে গেছে অনেক।

নির্মল নমিনি

রমেশ মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা আগেই মারা গেছে। মা আর ছেলে। মায়ের হাই প্রেসার। বাবার মৃত্যুর পরে দুচার দিন কান্নার পরে আবার ছেলের কথা ভেবে রান্না ঘরে ঢুকে পড়লো। রমেশের একটি পার্টনার ছিল। মায়ের খুব অপছন্দ ওর নাম শুনলেই মা চটে যেত। প্রেসার বেড়ে যেত। মার জন্য শেষ পর্যন্ত রমেশ তার পার্টনারকেএড়িয়ে গেল।

* * *

বাবা ছিলেন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ। শেষ জীবনে কিন্তু বলে গিয়েছিলেন অশৌচ মানতে হবে না। শ্রাদ্ধও করতে হবে না। শুধুমাত্র শ্মশান যাত্রীদের একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দিলেই হবে। রোজ রোজ আতপ চালের পিণ্ডি খেতে ভাল লাগে না দিনে হবিষ্য রাতে দুধ খৈ।

একদিন রাতে মাকে বলেই ফেলল—মাছ না হয় নাই খেলাম, দুচার খানা লুচি ভেজে দাওনা।

মা—ছিঃ।

রমেশ—বাবাও ওসব মানতে বারণ করে গেছে।

মা—লোকে তো মানে। দালদার গন্ধ পেলে সকলে টের পাবে। আর দুএকটা দিন একটু কষ্ট কর বাবা। মায়ের অভিমত সংক্ষেপে হলেও শ্রাদ্ধ করতে হবে।

—বাবা তো বামপন্থী ছিল।

—আবার পুজোও করতো।

—একেই বলে বাঙ্গালী। কালিও চাই, কার্ল মার্কসও চাই।

—বহুত আচ্ছা।

*

কিছুদিন পরের কথা।

রমেশ—বাবাকে টাকা পয়সার একাউণ্টগুলোর নমিনি করেছিলুম। বাবা তো গেল।

এবার তোমার নামে করে ফেলি। দেখো তুমি আবার যেন মরে যেও না।

রমেশের মা সামান্য লেখাপড়া জানে। কথায় কথায় ছড়া কাটতে পারে। এটা মায়ের বৈশিষ্ট।

মার ঝটিতি উত্তর—মরণ মরণ করিব না ভাই।

মরার কোন চান্স নাই।

তোর বিয়ে দিই। তারপর……

—রাখোতো বিয়ে, কিবা আয়।

—তাই বলে বিয়ে করবি না।

—বউ যদি তোমায় না দেখে?

—আমাকে না দেখুক, তোকে দেখলেই হবে। আমার আর কদিন। তবে হাঁ কথায় আছে—মেয়েদের জ্ঞান, কৈ মাছের প্রাণ।

* * *

দুর্ভাগ্য রমেশের এক বছরের মধ্যে মাও চলে গেল। পাড়ার লোক আর নিকট আত্মীয়রা মিলে ওর একটা বিয়ে দিয়ে দিল।

* * *

রমেশের জীবনে নতুন অধ্যায় সুরু হয়ে গেল। বলা বাহুল্য অধ্যায়টি সুখকর নয়। বৌ একাই একশ। সারাদিন টিভি দেখে। রাত্রে রাঁধতে চায় না। অফিস থেকে ফিরে রমেশ নিজেই চা করে খায়। চিনির জলে ডুবিয়ে পাঁউরুটি খাবে তবু রাঁধবে না। খালি ফাষ্ট ফুড আনতে বলে। আরে ফাষ্ট ফুডের দাম বেশি, তাছাড়া ওসব রোজ রোজ খাওয়া ভালো নয়। ভূতের

সংসার। গীতা, রমেশের বউ রমেশকে বসে থাকতে দেখলে জবলে ওঠে।

গীতা—যাও গঙ্গা জল আন।

রমেশ—কেন?

গীতা—লক্ষ্মী পুজোর জন্য।

রমেশ—সে তো পৌষ মাসে।

গীতা—এখন জলটা পরিস্কার!

রমেশ—আজ পারবো না।

গীতা—ছাদে লেপ মেলে দিয়ে এসো।

রমেশ—বর্ষাকালে কেউ লেপ শুকোতে দেয়।

গীতা—বৃষ্টি এলে তুলে নেবে।

রমেশ—কাগজ পড়লে, টিভি দেখলে, বসে থাকলে তোমার নিম্নাঙ্গ ফেটে যায়।

গীতা—কাজ করো বাজে বকো না ড্রেনটা সাফাই করো।

—কি জবালাতন।

ওর বাবা কোনদিন মায়ের গায়ে হাত তোলেনি। ঝগড়া করেছে বহুত বার। রমেশেরও হাত ওঠেনা। বাবা মার কথা মনে পড়ে। চোখে জল আসে, গীতার কাছে গোপন করে। গীতা তো রমেশের দুঃখের মর্ম বোঝে না। অফিসে গিয়ে মুখ ভার করে বসে বসে শুধুই বিড়ি টানে।

অফিস কলিগরা বলে—কিরে খবর কি? নতুন বিয়ের পর মুখ ভার কেন?

—শরীর খারাপ?

—না।

—তবে?

—মন।

—বৌ-এর সঙ্গে খিঁচাইন হয়েছে?

—আর বলিস কেন, ভীষণ জাঁহাবাজ মহিলা।

—টাকা পয়সায় টাইট দে।

—দেবো কিরে, কেড়ে নেয়। অফিস বেরোনোর সময় গুনে গুনে গাড়ি ভাড়া আর চা বিড়ির খরচ দেয়। গত রবিবার ইয়ার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একটা ফ্ল্যাট বাড়ির তলায় চা খাচ্ছিলাম বাড়ি থেকে দেখা যায়। হঠাৎ ভাঁড়টা ফেলে দিলুম।

একজন দোস্ত জিজ্ঞাসা করল—কিরে চা ফেলে দিলি ?

—গার্জেন দেখছে।

—দেখলেই বা।

—বাড়িতে গেলে ঝগড়া করবে। এই চা খেয়ে গেলে আবার ?

—বলিস কিরে ? বাপের বাড়ি যায় না, অসুখ করে না ?

—নারে, পুলিশের মত সব সময় আমাকে ওঠ বোস করায়।

—তোর বাবার টাকা পয়সাগুলো ?

—দুঃখের কথা কি আর বলবো। বাবাকে নমিনি করলাম মরে গেল। মাকে করলাম, মাও গেল। নমিনি আমার ভাগ্যে নেই রে।

—একটা পরামর্শ দেবো শুনবি ?

—বল।

—বৌকে নমিনি কর, মরে যাবে।

—যদি না মরে, তবে তো ঘোর বিপদ।

—তুই ভালো পামিস্টের কাছে যা, কি বলে দেখ। তারপর দেখা যাবে। মতলবটা মন্দ নয়, দেখাই যাক না মনে মনে ভাবে রমেশ। দরজা বন্ধ করে চড় থাপ্পড় দিলে বধূ নির্যাতনের মামলায় ফাঁসিয়ে দেবে।

*　　　*　　　*

বন্ধুদের পরামর্শে ও অকৃপণ দানে বিখ্যাত এক পামিস্টের

কাছে গিয়ে রমেশ গোপনে হাত দেখাল। ওঁর নাম জগৎগুরু নরেন ঠাকুর। আনন্দ বাজারে প্রায় বিজ্ঞাপন করেন।

জ্যোতিষীর অভিমত কুষ্ঠীটা আনলে ভাল হত।

রমেশ—আমাদের গুষ্ঠিতে কারুর কুষ্ঠী নেই।

দীর্ঘক্ষণ হাত দেখলেন উনি। আতস কাঁচ দিয়ে, উল্টে পাল্টে দেখে।

গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—মহাগুরু নিপাত হয়েছে?

রমেশ—হাঁ, বাপ মা দুই।

জ্যোতিষী—এবার একান্ত আপন আর একজনের বিয়োগ যোগ আছে।

রমেশ বহুত খুসী।

—কে?

—বুঝতেই তো পারছেন।

—সদ্য বিয়ে করেছি যে!

—সদ্যই হোক, আর অদ্যই হোক, যাবেই। আপনাকে একটা পাথর ধারণ করতে হবে, দাম বেশি নয়।

—কবে আসবো বলুন?

—খুব তাড়াতাড়ি আসবেন।

—নমস্কার।

* * *

আবার অফিস।

—কিরে খবর কি? কেস এগোল।

—হাঁ। বউ মরে যাবে বলছে।

—বহুত আচ্ছা। তুই তো মরছিস না।

—আর নমিনি?

—গত শনিবারে করে ফেলেছি।

—বউ কি বললো?

—মহা খুসী। অন্যদিন চা করে খেতে হয়। সেদিন পোস্ট অফিস থেকে ফিরতে গরম দুধ খাওয়াল।

—জিও।

—বউ পে বিলটা দেখে মিলিয়ে নেয়। কিন্তু সেকেন্ড আর ফোর্থ স্যাটারডেটা গোলমাল করে ফেলে। মুখ্যু হলে অনেক সুবিধে। কিন্তু মাল অর্ধ শিক্ষিত। সাংঘাতিক জীব। একটা শনিবারে অফিস বেরোবো বলে মেরে দিলুম একটা নুন শো। 'কভিখুস, কভিগম'। দারুণ লাগলো। মামাতো ভাইকে ফোন করে বলে দিলুম গীতা যদি ফোন করে বলবি তোর অসুখ দেখতে গিয়ে ছিলুম। ঠিক আছে। আর যায় কোথায় বাড়ি ফিরে ফেঁসে গেলুম।

—কি রকম ?

—শোননা।

রীতা—কোথায় গিয়েছিলে ? দেরি কেন ?

—মামাতো ভাই-এর অসুখ দেখতে গিয়েছিলুম।

—গায়ে সেণ্টের গন্ধ কেন ?

—ওর বাচ্ছাটা লাগিয়ে দিয়েছে।

—পকেটে গোলাপ ফুল কেন ?

—অফিসে একজনের ফেয়ার ওয়েল ছিল তাই সকলকে ফুল দিয়েছে।

—বুঝেছি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি! তড়িৎ গতিতে বাইরের দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র সর্টপ্যাণ্ট পরিয়ে নীল ডাউন করিয়ে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

—বলিস কিরে। এতো সাক্ষাৎ ডাইনী।

—ক্যালাতে পারিস না ?

—একদিন রেগে গিয়ে চেষ্টা করেছিলুম। বাপরে বাপ সে

কি চিৎকার! উল্টে পাড়ার লোক এসে আমাকে চোখ রাঙিয়ে গেল। সাবধান বধূ নির্যাতনের মামলায় ফেঁসে যাবে ইত্যাদি।

—যাকগে তারপর কি হল বল? তুই তো নীল ডাউন হয়ে রইলি।

—গীতা পাইখানায় ঢুকলো। আমি চান্স নিলুম। খানিকটা ওঠ বোস করে রান্না ঘরে গিয়ে একবাটি দুধ সাবড়ে দিয়ে খানিকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে ভাল করে মুখ মুছে আবার দাঁড়িয়ে পড়লুম।

গীতা বেরোল।

—এতক্ষণ কি হচ্ছিল?

—কি আর হবে, পা ফেটে যাচ্ছে এবার 'মুঝে মাপ কিজিয়ে'

—লুকিয়ে চুরিয়ে খুব হিন্দী সিনেমা দেখ না?

—আরে নারে বাবা।

—তবে ডায়ালগ দিচ্ছ।

—ঐ পাড়ার ছেলেরা বলে তাই।

গীতা রান্না ঘরে ঢুকলো। মনে মনে প্রমাদ গুনলো রমেশ।

একটা বিকট চিৎকার দুধ কোথায়, দুধ, এত ছড়ান ছিটোন কেন?

—বেড়ালে খেয়ে গেছে।

—তাড়াতে পারনি?

—তুমি তো বলেছ নট নড়ন চড়ন।

—তাই বলে, ছ্যাঃ।

*　　　*　　　*

পরের দিন আবার অফিস। রবিবার বা অন্য ছুটির দিন রমেশের কাছে ছোটাছুটির দিন। আতঙ্ক।

—অফিস ক্যান্টিনে সহকর্মীদের আবার প্রশ্ন—কিরে মরার লক্ষণ টক্ষণ দেখছিস?

—নারে ভাই, উল্টে ওয়েট বেড়েছে। গাল দুটো শীত কালের লাল মুলোর মত চিক চিক করছে বেশ কেমন ফ্রেস।

—কি করে বুঝলি ওজন বেড়েছে, ভাল আছে?

—নিজেই হাসপাতালে গিয়ে থরো চেক আপ করিয়ে এসেছে।

—বহুত ঝানটু মাল।

—মরার কোন লক্ষণ নেই রে।

—যা অফিসে হাফ ছুটি করিয়ে তোর সেই নরেন ঠাকুরকে বল হয় পাথর ফাতর দিন যাতে এখুনি পটকে যায়। যত সব বুজরুকি।

—তোরা না বললেও যেতুম রে।

লেখকের কৈফিয়ৎ

ইংরাজি রস সাহিত্যে humar satire, pun প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেনীতে হাসিকে চরিত্র অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়েছে। তেমনি বাংলায় শ্লেষ, ব্যঙ্গ, চুটকি প্রভৃতি নানা ধরনের হাসির কথা শোনা যায়।

আমার লেখাগুলি কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে জানি না। পাঠকরাই শ্রেষ্ঠ বিচারক। তারাই ঠিক করবেন কি ধরনের হাসির গল্প এগুলি। গল্পগুলির কিছু কিছু সত্য ঘটনা নিয়ে কিন্তু অধিকাংশই কাল্পনিক। হাসি, কাশি নয়। পড়তে ভাল লাগলে বাসি হলেও মনে হবে না। কিন্তু কেন লেখা? হাসতে আমি খুব ভালবাসি, বলা বাহুল্য হাসাতেও। যদিও বিকট দন্ত পংক্তির জন্য হাসলে আমাকে কুৎসিত দেখায়।

সম্প্রতি আমার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। প্রতিভার হাসি ছিল মার্জিত। অট্টহাস্য ওর আসতো না। কিন্তু দীর্ঘ রোগ যন্ত্রণায় হাসি সঙ্গীত হারা হয়ে অমাবস্যার কারার ওর জীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যুবক বন্ধু নবকুমার বিশ্বাসের এবং প্রাক্তন সহকর্মী পীযুষ মুখার্জীর অনুরোধে এই লেখা। সাধারণত গল্প লিখতে জানি না। লিখতে পারি প্রবন্ধ। অথচ প্রবন্ধ লেখা আর আসে না। স্ত্রী বিয়োগের মানসিক যন্ত্রণায় আমার জীবনের হাসি অস্তমিত। কিন্তু সমাজে আমার থেকেও দুঃখী মানুষ তো আছে। তাদের জন্যই এই লেখা।

নিজের হাসি যখন অশ্রুতে পরিণত হয়েছে তখন অন্যরা হাসতে পারলে আমি পরিতৃপ্ত হই।

শেষ কথা আমার পুত্র সৌভ্রাত্র ও পুত্র বধু অভির্কাও চায় আমি লিখি। ওদের ধারণা লিখতে পারলে আমি ভালো থাকবো। ওরা খুব উৎসাহ দেয়, অবকাশ তৈরী করে দেয়। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে আর তো কোন কাজ নেই। লেখার কাজও সম্ভবতঃ শেষ, কারণ চোখ নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। আর কিছু করার নেই। কিছু কিছু স্ল্যাং ভাষা ব্যবহার করেছি লেখার মধ্যে কারণ মস্তান, জেলের কয়েদি, চ্যাংড়া ছেলেদের ও মদের ঠেকের ভাষা ও শিক্ষকের ভাষা অভিন্ন নয়। তাদের চরিত্র চিত্রণে তাদের মুখের উপযুক্ত ভাষা ব্যবহারে দোষ দেখি না। যার যেমন লাগে সে তেমনি ভাবেই গ্রহণ করবে। আমার করার কিছু নেই। গুন্ডা বাংলু ঠেক মস্তান ও জেলের কয়েদিদের কিছু সাংকেতিক ভাষা আমার জানা আছে। সেগুলি ব্যবহার করেছি চরিত্র অনুযায়ী। গল্প না বলে লেখাগুলিকে সরস রচনা বলাই শ্রেয় বোধহয়।

বলাই চক্রবর্তী